সত্যের সন্ধানে



ভারতবাসীর সভ্যতার ধারাবাহিকতা

ডঃ কৃষ্ণকান্ত সরকার

রহস্যাবৃত সুভাষচন্দ্র

ডঃ রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যের সন্ধানে

ভারতবাসীর সভ্যতার ধারাবাহিকতা
ডঃ কৃষ্ণকান্ত সরকার

রহস্যাবৃত সুভাষচন্দ্র
ডঃ রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

চারুপত্র প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০১২

প্রকাশক : তাপসী আচার্য
চারুপত্র প্রকাশনী
৭১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা - ৯
চলভাষ : ৯৮৩০০৩১৭৫১

গ্রন্থস্বত্ব : পুতুল সোম ও রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : সোমাদিত্য ব্যানার্জ্জী

বর্ণবিন্যাস : কম্পিউটার ডট ল্যাণ্ড
৭১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা - ৯

মুদ্রণ : কম্পিউটার গ্রাফিক্স
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড,কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মূল্য : ৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : সেতু প্রকাশনী, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩
কুণ্ডু বুক স্টল, ১নং প্লাটফর্ম, হাবড়া স্টেশন
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
সাধনা বুক স্টল, ৪নং প্লাটফর্ম এবং বারাসাত স্টেশন
চারুপত্র প্রকাশনী, ৭১, কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯

"There is no evidence in the Vedas of any invasion of India by the Aryan race and its having conquered the Dasas and Dasyus supposed to be natives of India."–**Dr. B. Ambedkar**

লেখকের কথা

প্রায় ৩৫০০ বছর পূর্বে বিদেশী আর্যরা ভারত আক্রমণ *('Aryan invension')* করে এবং অনার্য ভারতবাসীদের যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। এই আর্য আক্রমণ তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও প্রচার চলছে যদিও আর্য-অনার্যের যুদ্ধের আজও কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু ৮৫০০ বছর প্রাচীন ভারতের মেহেরগড় সভ্যতার এবং ৫৫০০ বছর প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার হাজার হাজার প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে। মেহেরগড় ও হরপ্পা সভ্যতা থেকে যে সমস্ত নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে এবং বৈদিক সাহিত্য থেকে যে সমস্ত তথ্য জানা গেছে তার মধ্যে অনেক মিল দেখা গেছে। আমরা নব্য প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার প্রমাণ অনেক বিষয়েই দেখতে পেয়েছি। যদিও তথাকথিত আর্যদের ভারতে আক্রমণ ও সভ্যতা সৃষ্টি সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে কিন্তু নব্যপ্রস্তর যুগ থেকে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে কোন গবেষণাই সম্ভবত হয়নি। ভারতীয় সভ্যতার গবেষণার ক্ষেত্রে এই শূন্যস্থান পূরণ করার প্রচেষ্টাই হল বর্তমান গবেষকের এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

'ভারতের সভ্যতার ধারবাহিকতা' বর্তমান গবেষণামূলক রচনার সামান্য অংশ শ্রীজগন্নাথ ঘোষ মহাশয় সম্পাদিত *বিহান* ২০১২ বইমেলা সংখ্যায় 'দুইটি ঐতিহাসিক তত্ত্বের সত্যতা বিচার' শিরনামে প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকেই বর্তমানে প্রকাশিত 'ভারতের সভ্যতার ধারাবাহিকতা'র উৎপত্তি। বন্ধুবর জগন্নাথকে মামুলি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাইনা। চারুপত্র প্রকাশনীর কর্ণধার কবি তাপসী আচার্য বর্তমান গ্রন্থ *সত্যের সন্ধানে* দক্ষতার সঙ্গে বর্ণসংস্থাপন ও এবং শ্রী বিজন চৌধুরী মহাশয় মুদ্রণে সহায়তা করার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

— কৃষ্ণকান্ত সরকার

ভূমিকা

সত্যের সন্ধান কোনও সহজ কাজ নয়, শানিত ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাঁটার মতন। তা সত্বেও গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীর নাম দেন সত্যান্বেষণ। এই গ্রন্থের দুজন লেখক লেখিকা এই কাজ দুরূহ জেনেও সেই কর্মে ব্রতী হয়েছেন। প্রথম জন কৃষ্ণকান্ত সরকার ভারতবাসীর সভ্যতার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে নিজের বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছেন।

শ্রী সরকারের অনুসন্ধান প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে। তিনি প্রচলিত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতানুসারী বক্তব্য—ভারত বিদেশী আর্যদের দ্বারা বিজিত হলে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয় এই ধারণা অলীক বলে মত প্রকাশ করেছেন। এর প্রধান কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন যে আর্যদের ভারত আক্রমণ ৩৫০০ বছর পূর্বে ঘটেছিল। অথচ প্রত্নতাত্বিক উৎখননের ফলে জানা যায় যে প্রাচীন ভারতের মেহেরগড় অঞ্চলে ৮৫০০ বছর আগেও উঁচু মানের সভ্যতা ছিল এবং প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতারও সময়কাল ৫৫০০ বছর প্রাচীন। অনেক তথ্য এবং অনুমান সহযোগে লেখক ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হয়েছেন এবং আর্য বিজয় পর্বটিকে অবিশ্বাস্য বলে বর্ণনা করেছেন। শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনই নয় নৃতাত্ত্বিক এবং সামাজিক বিশ্লেষণের নিরিখেও লেখক এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমান আলোচকও সেই মতই পোষণ করেন।

আর্য কথাটি কোন জাতির নাম বলে জানা যায় না। আর্য কথাটির অর্থ ভদ্র বা ঋজু। সে যুগে কেন এখনও অবিভক্ত ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে দীর্ঘদেহী, সুসভ্য ভারতীয়দের দেখা মেলে। যদু, কুরু, পাঞ্চাল, দ্রুহ, তুর্বসু জাতির নাম, আর্য কোনও জাতির নাম নয়। যাঁরা বিলেতে পড়াশুনো বা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মগজেও এই ধারণা বাসা বেঁধেছে। সব সভ্যতাই ব্রিটিশ সভ্যতার মতোই পশ্চিম থেকে পূর্বে এসেছে বলে স্বতঃসিদ্ধ মনে করা হয়। সভ্যতার আঁতুড়ঘর যে ভারতও হতে পারে এবং সেই সভ্যতার ঢেউ যে পূর্ব থেকে পশ্চিমেও যেতে পারে একথা এতদিন অনুচ্চারিত ছিল। এমন কী শোনা যায় যে ইংরেজরা ভারত জয়ের পরে তাদের এই ভারত জয়কে পূর্বতন পশ্চিমী ভারত বিজয়ের প্রত্যাবর্তন বলে প্রচার করতে চায় এবং সেই মর্মে ম্যাক্স মূলারকে নিয়োগও করা হয়। এই তথ্য এডমাণ্ড লীচ এবং দিলীপ চক্রবর্তীর লিখায় পাওয়া যায়। ভারতবাসী নির্বীর্য ও অসভ্য এটা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য। এ এক সাম্রাজ্যবাদী মগজধোলাই-এর প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। এই ধারণা হিন্দুত্ববাদীদের অপপ্রচার বলে বিলিতী কেতাদুরস্ত এবং মার্কসবাদী লেখকদের মধ্যে এক ধরণের বিজাতীয় মনোভাব কাজ করে। লেখক এই বির্তকিত প্রবন্ধে তার অসত্যতাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

গ্রন্থের অপর সত্যানুসন্ধানী শ্রীমতি রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেই বহু চর্চিত অথচ রহস্যাবৃত সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান পর্বের পুনর্বিবেচনা করতে চেয়েছেন। এর কারণ এই যে লেখিকা স্বয়ং মুখার্জ্জী কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং বহু দেশ ঘুরে জাস্টিস মনোজ মুখার্জী যে বিপুল তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তিনি সেগুলি পাঠ করার সুযোগ পেয়েছেন। তীক্ষ্ণ যুক্তি এবং তথ্যের সাহায্যে তিনি দেখাতে পেরেছেন যে পূর্ববর্তী শাহনওয়াজ কমিশন এবং খোসলা কমিশন যে তথ্য ও যুক্তির উপর তাদের বক্তব্য পেশ করেছিলেন, তার অনেকটাই ভ্রান্ত অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি নিপুনভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তাইপের বিমান দুর্ঘটনা, রেনকোজির চিতাভষ্ম সবই সাজানো গল্প। ইচিরো ওকুরা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে সেই মরদেহকেই সুভাষচন্দ্র বোস বলে চালানো হয় এবং ডাক্তার ইয়োশিমির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া সত্ত্বেও তার দুর্বল বিবৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণ ক'রে তিনি সুভাষচন্দ্রের বদলে ইচিরো ওকুরারই চিতাভষ্ম বলে রেনকোজির মন্দিরের ভষ্মাধারকে সনাক্ত করেছেন। তার মধ্যে ঐ ভষ্ম এবং হাড়ের ডি.এন.এ. পরীক্ষা নিয়ে টালবাহানা উদ্ঘাটিত করেছেন। এই পর্ব আগে এইভাবে আলোচিত হয়নি।

প্লেন দুর্ঘটনা আগেও অনেকবার আত্মগোপনের কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সুভাষও তার ব্যতিক্রম নন। তিনি অকাট্য যুক্তিতে দেখিয়েছেন যে সুভাষ মাঞ্চুরিয়া যাত্রা করে রাশিয়াতে উপনীত হ'ন। যেহেতু রাশিয়া তখন মিত্র পক্ষীয় সেই জন্য তাঁকে অপর পক্ষের যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জেলে রাখা হয়। তারপর রাশিয়া, বৃটেন এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক মতবিনিময় চলতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত সুভাষের কি পরিণতি হয়, সেটাই রহস্যাবৃত। সেই চাবিকাঠি এখনও খোলা যায়নি কারণ এই শেষ তথ্য ঐ ত্রয়ীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে। লেখিকা উপসংহারে বলেছেন মুখার্জী কমিশনের তিন খণ্ড বিবৃতি ভারত সরকারের কাছে জমা পড়লেও তা অদ্যাবধি প্রকাশ করা হয়নি এবং মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টকেও বাতিল করে দেওয়া হয়। এইসব তথ্য উন্মোচিত হলে বুদ্ধিমান পাঠকেরা নিজেরাই অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা করে ফেলতে পারেন এমন দুর্ভাবনা ভারত সরকারের আছে।

আজ এত বছর পরে নিশ্চয়ই নেতাজী মহানিষ্ক্রমণ করেছেন তবু ভারতীয়রা এই দেশবরেণ্য নেতার শেষ পরিণতি জানতে আজও উন্মুখ। লেখিকার এই গ্রন্থ ঐ জিজ্ঞাসার চিহ্নটিকে প্রবলতর করবে।

এই দুই সত্যানুসন্ধান একত্রে প্রকাশিত হ'ল এবং আশা করা যায় পাঠক সমাজে 'সত্যের সন্ধানে' সাড়া তুলবে

ড. চিত্তব্রত পালিত
ইমেরিটাস্ অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবাসীর সভ্যতার ধারাবাহিকতা

*'পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলি বর্ব্বর অবস্থা থেকে উঠে আসার বহুকাল আগে ভারতবর্ষের অধিকারে ছিল একটি ভাষা যা উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ-শুদ্ধ পূর্ণতার জন্য, অসংখ্য এবং বহু বিচিত্র গ্রন্থের অনেকগুলিরই বিষয় বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা যা এই ভাষায় সৃষ্টি করতে দরকার হয়েছিল উচ্চতর স্তরের প্রতিভা।'—হেনরি বিভারিজ**

[এক]

আমরা স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে অনেক বিষয় পড়ি ও শিখি। একই কথা দীর্ঘকাল ধরে শেখানোর ফলে কোন কোন মতবাদে আমরা অনেকে প্রথম বিশ্বাসী ও ক্রমে ক্রমে অন্ধবিশ্বাসী হই। যদি প্রচলিত কোন এক মতবাদ সত্য না হয়, আর সেই মতবাদে দেশের মানুষকে যদি বিশ্বাসী বা অন্ধ বিশ্বাসী করা হয় তার ফলে দেশের ও জাতির কি ক্ষতি হতে পারে না? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানীর মত সত্য কিনা তা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হয়। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (যেমন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা না করে প্রচলিত মতবাদকে দশকের পর দশক শেখান চলতে থাকে। ফলে মানুষ একপ্রকার অন্ধবিশ্বাসী হয় যা জনস্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ বিরোধী।

শৈশবের শিক্ষা বহুদিন মনে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ কর্তৃক 'ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য' *ইতিহাস (প্রাচীন)* গ্রন্থে ১৯৯৪ থেকে ১৬ বছর ধরে শেখান চলছে— 'সুমের ও মিশরের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল অন্য অঞ্চল থেকে আসা

---

*"Long before the nations of Western Europe had begun to emerge from barbarism, it (India) was in possession of a language remarkable for the completeness of its grammatical forms, for copiousness, and for the number and variety of the works which had been written in it. Several of these works were of a scientific and malaphysical character, requiring talent of a higher order"...–**Henry Beveridge**, ***A Comperehensive History of India,*** v. 1, p. 18

যাযাবর মানুষেরা। সিন্ধু সভ্যতার বহুকাল পরে ভারতবর্ষে গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে তুলেছে আর্যরা। তারাও এসেছিল ভারতবর্ষের বাইরে থেকে' (পৃ. ৩৯, প্যারা১)। শৈশবকালে একথা শিখে শিখে আমরা বিশ্বাসী হয়ে গেছি যে সভ্যতাহীন জাতি ছিলাম আমরা। বাইরের সভ্য মানুষ এসে আমাদের সভ্য করেছে, তারা ভারতের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। এর ফলে কি হীনমন্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হলনা?

আর্যরা যে বাইরে থেকে এসেছিল তার সাক্ষ্য প্রমাণের সামান্যতম উল্লেখ নেই কেন?

বি.এ. অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস গ্রন্থে লেখা 'আর্যদের প্রাচীন সাহিত্যের নাম বেদ...। ঋগ্বেদের রচনাকাল জানলে আর্যগণের ভারতে আগমনের সময় জানা যায়। কারণ ঋগ্বেদেই আর্যদের আদি যুগের কথা জানা যায়' (প্রভাতাংশু মাইতি ও অসিত কুমার মণ্ডল, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, পৃ. ১১২)। শ্রদ্ধেয় লেখকদ্বয় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত আর্যগণের ভারতে আগমনে বিশ্বাসী নন যদিও আর্যগণের আগমনের কথা লিখেছেন। কারণ সুস্পষ্টই তাঁরা লিখেছেন, 'এ সম্পর্কে প্রমাণ হিসাবে কোন লিখিত দলিল বা শিলালিপি নেই। কেবলমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের সহায়তায় আর্যগণের আদি বাসস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা পণ্ডিতেরা করেন' (ঐ, পৃ. ১০৪)। আমরা কার্বণ টেস্ট শুনে থাকি জীবাশ্মের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে এবং ডি.এন.এ টেস্ট বংশ ও জাতিধারা নির্ধারণে। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি দেওয়া হলেও কোনপ্রকার টেস্ট দ্বারা যে ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ সংগ্রহ সম্ভব তা আমাদের জানা নেই। কোন তত্ত্ব যদি প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত না হয় তা স্বার্থ গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রচারিত হতেই পারে। কয়েকটি ভাষার মধ্যে মিল দেখে কিছু একটা অনুমান করা যায়। সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার মধ্যে মিল দেখে অনেক কিছুই কল্পনা করা যেতে পারে কিন্তু আর্যজাতির ভারত আক্রমণ ও আগমন তত্ত্বের প্রমাণ তাতে মেলেনা।

তাছাড়া, ঐ তিনটি ভাষার শব্দগুলির মধ্যে মিল ও অমিলের শতকরা হিসাবও অজানা।

A Sanskrit-English অভিধান অনুসারে আর্য 'একজন শ্রদ্ধেয় বা সম্মানীয় অথবা নিজ দেশের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসযোগ্য মানুষ, আর্যাবর্তের একজন অধিবাসী, জাতির নাম যা মধ্য এশিয়া থেকে আর্যাবর্তে বাস করতে এসেছে, দাস, দস্যু, অনার্যের বিপক্ষ।

অভিধান অনুযায়ী এবং ইতিহাস লেখকদের মতে (১) আর্য সম্মানীয় মানুষ

ও (২) জাতি, (৩) বাইরে (মধ্য এশিয়া) থেকে তারা এসেছিল, (৪) তারা এসে ভারতে বেদ সৃষ্টি করেছে, (৫) ভারতের সভ্যতা তাদেরই সৃষ্টি। আমাদের বিশ্বাসী করান হয় ভারতে কোন সভ্য সম্মানীয় মানুষ ও সভ্যতা আর্যদের আগমনের পূর্বে ছিল না (আর্যদের ভারত আক্রমণ তত্ত্ব তৈরির সময়ে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কার হয়নি)। এই মতবাদের জন্মদাতা ও সম্প্রসারণকারিরা ছিলেন বাইরের মানুষ, বিদেশী। বিশেষত ইউরোপীয়। এই মতবাদের বিস্তার ভারতে যাঁরা করেছেন তাঁরা বিদেশী না হলেও বিদেশী গুরুর প্রায় অন্ধ শিষ্য।

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, সময়ের প্রেক্ষিতে বিবেচনা না করলে কোন তত্ত্বই বোধগম্য হয় না ('No theory is ever intelligible save in the context of its time'– H.J. Laski)। প্রকৃতি বিজ্ঞানের তত্ত্ব এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের (যেমন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান) তত্ত্ব বুঝতে সমকালীন রাজনৈতিক স্বার্থগোষ্ঠীর চাহিদা, স্থান ও পরিস্থিতি মাথায় না রাখলে চলেনা।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হয়। ইংরেজ বিদেশী। ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ করে প্রথম বাংলা অধিকার করে। ১৭৬৫ সালে বিহার ও উড়িষ্যায় তাদের অধিকার সম্প্রসারিত হয়। কেবল বন্দুকের ও কামানের দ্বারা শাসন চলেনা। ইংরেজের ভারতে আগমনের কারণ এবং ইংরেজ শাসনের বৈধতা সৃষ্টির তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরির তখন তাদের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ইংরেজ উন্নত জাতি। ভারতবাসীর উন্নতির জন্য এসেছে যে ভারতবাসীর সভ্যতা-সংস্কৃতি ইংরেজ আসার আগে ছিলনা। আর্যরা অতীতে বাইরে থেকে ভারতে ঢুকে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির স্তম্ভ, বেদ সৃষ্টি করেছিল। তেমনিই ভারতবাসী যেন বুঝতে শেখে ইংরেজ জাতি বর্তমানে ভারতে এসেছে ভারতবাসীর শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্নতি ঘটাতে।

বিজয়ী হিসাবে ইংরেজের বাংলায় প্রবেশ ঘটল ১৭৫৭ সালে। ১৭৮৬ খৃ. বেঙ্গল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় স্যার উইলিয়ামস্ জোনস্ ঘোষণা করলেন যে সংস্কৃত, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাগুলির মধ্যে এমন মিল রয়েছে যেন তাদের একই সাধারণ উৎস। তাঁর এই বক্তৃতাই জন্ম দিয়েছিল একটি ভাষাতত্ত্ব তৈরির পরিকল্পনা (... 'in 1786, when Sir William Jones declared at a meeting of Royal Asiatic Society of Bengal that there was so much in common in Sanskrit, Greek and Latin languages that these may have had a common origin (Jones : 1788), little did he realize that he was inadvertently sowing the seeds of a major controversy'. (B.B. Lal, 'Archaeology of Sarasvati' in Sharma(s), *Early Harappans and...* pp. 252-66)।

১৮১৩ খৃ. টমাস ইয়ং নামে জনৈক ইংরেজ ইউরোপ ও এশিয়ার আদি ভাষার নাম দিলেন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। এই ভাষাটির গঠন, শব্দের মিল (বিভিন্ন ভাষার মধ্যে) খোঁজা ইত্যাদি সবই ইউরোপীয় গবেষকদের দ্বারা, এক কথায় তাঁরাই তথাকথিত আদিভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। ঐ ভাষাতত্ত্ব নির্মাণে ভারতীয় কোন গবেষকই যে ছিলেন তা আমাদের জানা নেই। আদি ভাষার দাবীদার হল জার্মানি, তারা নাম দিল ইন্দো-জার্মানিক, ঐ ভাষা ব্যবহারকারীরা 'জার্মান নরর্ডিক জনগোষ্ঠীভুক্ত' (ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ইতিহাসের আলোকে আর্য সমস্যা,* পৃ. ৮)। এদের বৈশিষ্ট্য— রঙ ফর্সা, লম্বা মাথা, টিকাল নাক, সোনালী চুল ইত্যাদি। অর্থাৎ যেমন দেখতে ইন্দো-জার্মান নরর্ডিক জাতি। জার্মানির বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত মোক্ষ মুলার 'আর্য' কথাটি সমধিক ব্যবহার করেন (মুখোপাধ্যায়:১০)। ইংরেজ আগমনের পরে এই তত্ত্বের সৃষ্টি ও প্রচার হয়। '১৮৫৮তে জন উইলসন এই অভিমত প্রচার করলেন যে বহু পূর্বে যেমন আর্যদের এক শাখা ভারতে এসে দস্যুদের দমন করেছিল, তেমনি ঐ জাতির আর এক শাখাভুক্ত লোকেরা অর্থাৎ ইংরেজরা ভারতে পূর্বের আর্যদের এবং দস্যুদের উপরে আধিপত্য স্থাপন করেছে। অতএব বৃটিশরা ভারতে আর্য শাসনের ন্যায্য ও সঙ্গত উত্তরাধিকারী (মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১০)। উপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির ধারায় যে মতবাদের উৎপত্তি হয় আর্য তত্ত্ব হলো তার একটি উদাহরণ, স্থান ও কাল বিচারে।

আর্যরা কোথা থেকে এলো? কোন সময়ে ও কোন পথে ভারতে এলো?

আর্যদের আদি বাসভূমি খোঁজার ও চিহ্নিত করার কাজ ১৫০ বছরের বেশী সময় ধরে চালিয়েও গবেষকেরা আজও একমত হতে পারেননি ['From more than 150 years scholars have sought to locate the homeland of the Indo-Europeans and trace their migrations across Eurasia to their historic seats. Whenever there has appeared significant agreements, new theories diametrically opposed have always arisen to challenge'... (J.P. Mallory, 'Indo-European Phenomenon : The Homeland Problem', UNESCO, *History,* vol 2, p.81]।

উন্নত আর্যজাতির হোমল্যান্ডের দাবীদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে সেই তথাকথিত বাসভূমির বিশালতা এমনই দাঁড়িয়েছে যা অবিশ্বাস্য। ঠাট্টা করে গবেষক মাল্লোরাই বললেন, 'প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক, উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু সর্বত্রই ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের হোমল্যান্ড পাওয়া গেছে ['Indo-European homelands have been found between Atlantic and Pacific

Oceans and at both North and South Poles'. ibid]। কমপক্ষে ৪৫জন আন্তর্জাতিক মানের গবেষকের (ভারতীয় কোন গবেষকের নাম নেই) গবেষণামূলক লেখা বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে আর্যদের প্রস্তাবিত আদি বাসভূমির আকার সম্বন্ধে হয় অবিশ্বাস বৃদ্ধির সৃষ্টি হয়েছে অথবা এই জাতি ও তার পুরাতাত্ত্বিক-সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক প্রায় না থাকায় বা অবোধ্য হওয়ায় ভাষাভিত্তিক আর্যদের জাতিসত্তা তত্ত্ব গ্রহণ করতে (মনকে) বাধ্য করেনা (...'it must either propose areas of increasingly implausible size or archaeological culture with little or no conceivable interrelationship that might impel us to accept an underlying linguistic identity' (Mallory, op.cit, p.90)। মেহেরগড়, সরস্বতী ও সিন্ধু সভ্যতার মানুষদের তৈরি বাসনপত্র সহ অন্যান্য শিল্পসম্ভারে আছে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ কিন্তু বহিরাগত আর্যদের তৈরি কোনো বাসনপত্র বা অন্যান্য শিল্পসম্ভার আবিষ্কৃত হল না কেন? হয় তারা বাসনপত্র কিছুই তৈরি করতে জানতেন না, মাটিতেই খাদ্য খেতেন অথবা তারা এদেশেই আসেনি।

সত্যি বলতে কি, পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশের মানুষ যখন বর্বর জীবন ত্যাগ করতে পারেনি, তার বহু আগে ভারতে ছিল সম্পূর্ণ ব্যাকরণ শুদ্ধ এক পূর্ণ ভাষা, যে ভাষায় বহু বিষয়ে বেদ সহ বহু মূল্যবান গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে যা সৃষ্টি করতে দরকার হয়েছিল উচ্চস্তরের প্রতিভা। ভারতের এই সংস্কৃত ভাষা কত শত বা সহস্র বছর প্রচেষ্টার ফলে পরিপূর্ণ শুদ্ধ ভাষা রূপে সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের অজানা (Henry Beverige, *op. cit.*)।

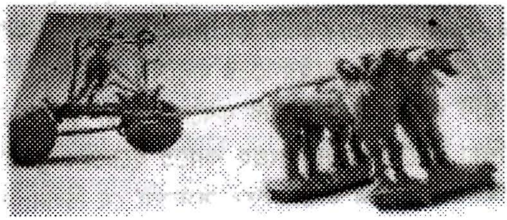
যদিও মানুষ চাঁদে গিয়ে নিদর্শন সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু পৃথিবীর কোনখানে তথাকথিত 'আর্যদের' বাসভূমি তা নির্ধারণ আজও অসম্ভব রয়েছে। আর্যদের হোমল্যান্ডের ধারণাটি 'অস্বাভাবিক' বোঝানোর জন্য 'Phenomenon' শব্দটি মাল্লোরাই ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়।

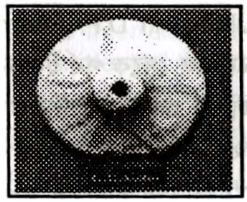
বলা হয় 'ঋগ্বেদ রচনাকাল জানলে আর্যগণের ভারতে আগমনের সময় জানা যায়।' মোক্ষ মুলারের মতে ঋগ্বেদ সৃষ্টি সমাপ্ত হয়েছিল খৃ.পূ. ১০০০ বছর সময় কালে, শুরু হওয়ার সময়কাল নির্ণয় করা অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন ('Whether the Vedic hymns were composed 1000, or 1500 or 2000 or 3000 years B.C. no power on earth will ever determine)। বোখজকাই ও তেল এল আর্মানা শিলালিপি দুটির প্রথমটিতে মিত্র ও বরুণ দেবতার নাম এবং দ্বিতীয়টিতে 'সিরিয়ার রাজাদের নামকরণে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব' দেখে কেহ কেহ ঋগ্বেদের রচনাকাল ১৪০০-১০০০ খ্রী: পূ. মনে করেন। আর্যগণ ৩০০০ থেকে

৩৪০০ বা ৩৫০০ বছর পূর্বে নাগাদ নাকি ভারতে আসে। এই শিলালিপি দুটিতে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক মিলের প্রমাণ প্রত্ননিদর্শন থেকে মেলে কিন্তু ভারতে আর্য আগমন তাতে প্রমাণিত হয়না। ড. এস সিং-য়ের মতে ইরানের মধ্য দিয়ে বৈদিকভাষী মানুষ যে ভারতে প্রবেশ করেছিল পশ্চিম এশিয়ার উৎকীর্ণলিপি সে সম্ভাবনা খারিজ করেছে ('The West Asian inscriptional evidence has ruled out any possibility of Vedic speakers passing through Iran on their way to India.– S. Sing, '5th-4th Millennium Dating Rigveda Culture,' in D.P. Sharma, *Early Harappans*, v.I, p.206)। পাঁচ সহস্রাব্দ সময়কাল থেকে পূর্ব ইরানের সঙ্গে ভারতের মেহেরগড়ের মানুষের যে যোগাযোগ ছিল তা জানা যায় নীলকান্ত মণি পাথর মেহেরগড়ের কবরে পাওয়া থেকে যে পাথর পূর্ব ইরান বা মধ্য এশিয়া থেকে তাদের সংগ্রহ করতে হয়েছে। সুতরাং মেহেরগড়ের মানুষের মধ্যএশিয়া ও ইরানে যাতায়াতের সম্ভাবনা যে ছিলনা তা বলা চলেনা।

ড. সিং-য়ের মতে পশ্চিম এশিয়ায় যে লিপি আবিষ্কার হয়েছে তার ভাষা ইন্দো ইরানীয় নয়, ইন্দো এরিয়ান। তিনি বলেন যে পশ্চিম এশিয়ার বৈদিকভাষীরা ভারতেরই প্রধান বৈদিকভাষীদের ছড়িয়ে পড়া বৈদিকভাষী ('were splinter body of the Vedic- speakers of India'-*ibid* p. 183)। মনে রাখা দরকার ইরান থেকে ভারতের মেহেরগড়ের সভ্যতা বেশী প্রাচীন। উল্লেখ্য, ড. রফিক মুঘল যিনি পকিস্তানের চোলিস্তান মরুভূমিতে বিলুপ্ত সরস্বতী নদী ও সভ্যতার জরিপও প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কারের পরিচালক (Director) তিনি লিখেছেন যে এখন থেকে ৪০০০ বছর পূর্বে সরস্বতী নদীর বিনাশ হয়েছিল প্রাকৃতিক কারণে। এবং থর মরুভূমি ঐ অঞ্চল গ্রাস করার ফলে সরস্বতী সভ্যতারও বিনাশ হয়েছিল ('Recent Archaeological Research in Cholistan Desesert' in S.P. Gupta ed, *The Lost Sarasvati*)। ঋগ্বেদ নিজেকে সংজ্ঞায়িত করেছে সরস্বতী নদী-সভ্যতার সন্তানরূপে। ['The Rigveda... defines itself as the child of the civilization of the river Sarasvati'... (Rajaram : 466)]। ঋগ্বেদে আছে ৬০টি মন্ত্র সরস্বতী সম্পর্কে। যেমন, 'প্রাচীন ঋষি কর্তৃক সাম্যকরূপে সেবিতা আমাদের প্রিয়তমা, সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদিগের স্তুতিভাজন হয়', (ঋ ৬/৬১/১০)। বিদেশী পণ্ডিতদের মতে আর্যরা এসেছিল ৩৪০০ থেকে ৩০০০ বছর পূর্বে এবং তখন থেকে তারা বেদের সৃষ্টি করেছেন। অথচ প্রত্নতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে তথাকথিত আর্য আগমনকালের ৫০০ বছর পূর্বে মৃত হয়ে গিয়েছিল সরস্বতী নদী। তাহলে কি মৃত সরস্বতীর কূলে বসে বহিরাগত আর্যরা মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, 'সরস্বতী প্রবাহিত

হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন, এবং সকল জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছে' (ঋ ১/৩/১২)। আর্যরা যে ঐ সময়ে (৩৪০০-৩০০০) এসেছিলেন তা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের সঙ্গে মেলেনা। আবার বলা হতো যে ভারতবাসীরা ঘোড়া ও চাকার ব্যবহার জানত না, আর্যরাই জানত। সেই জন্যই যুদ্ধে আর্যরা জয়ী হয়েছিল। হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ঘোড়া ও চাকা সংগৃহীত হবার ফলে সে যুক্তিও অসত্য প্রমাণিত হয়েছে।





এখন ডিএনএ টেস্ট সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। 'উপসংহারে, ধারাবাহিকতা এবং আর এফ এল ডি বিশ্লেষণের প্রমাণ অনুযায়ী আমরা প্রস্তাব করি যে ইন্দো-ইউরোপীয় আক্রমণের সমর্থনে খুব কম পরিমাণ জাতিধারার প্রমাণ আছে... সার কথা হল, এখন যথেষ্ট কারণও ঘটেছে প্রশ্ন তোলার ইন্দো-ইউরোপীয়ানদের ভারত আক্রমণ সম্পর্কেই কেবল নয় ভারতবর্ষই যে সাধারণ মাতৃতান্ত্রিক বংশগতির ধারা ইউরোপে ছড়িয়ে বৈচিত্র সৃষ্টি করেছিল তাই এখন বিবেচনা করার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে "Finally, from sequence and RFLP analysis we suggest that there is very little genetic evidence supporting a massive recent Indo-Aryan invasion. Summing up, we believe that there are now enough reason not only to question a recent 'Indo-Aryan invasion' into India some 4000 BP (before the present) but alternatively to consider India as a part of the common gene pool ancestral to the diversity of human maternal lineages in Europe" (quoted in D K. Chakraboty, *Oxford Companion to Indian Archaeology*, p.22)।

পরিশেষে বলতে হয় ভারতে আর্যরা এসে অনার্য ভারতবাসীদের সভ্য যে করেছে তা কেবল অসত্যই নয় অপ্রাসঙ্গিকও বটে।

আর্যদের তথাকথিত আবির্ভাব এখন থেকে ৩৫০০ বছর পূর্বে। ভারতে হরপ্পা সভ্যতা ৫৫০০-৩৩০০ বছর প্রাচীন। হরপ্পা সভ্যতার ৩০০০ বছর পূর্বে মেহেরগড় সভ্যতা (৮৫০০-৫৫০০) শুরু। এবং দেখা যায় মেহেরগড়, হরপ্পা, বৈদিক ও বর্তমান সংস্কৃতির মধ্যে অনেক প্রত্ননিদর্শনের মিল ও ধারাবাহিকতা

আছে। এই ধারাবাহিকতা আজও চলছে। প্রত্ন নিদর্শন অনুসারে যে ভারত ৮৫০০ বছর পূর্বে মেহেরগড়ে সভ্যতার আলো জ্বেলেছে, সেই দেশে ৩৪০০ বছর পূর্বে আলো জ্বালাতে আর্যরা এসেছে এসব শেখানোর আর দরকার আছে? আর্য তত্ত্ব শেখান চলছে। যা করা হয় না তা হল নব্য প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান। বর্তমান লেখক সেই চেষ্টা শুরু করেছেন।

[দুই]

বিগত শতাব্দী ছিল আর্যতত্ত্ব প্রচারের যুগ। প্রচার চলেছে— ভারতের সভ্যতার স্রষ্টারা ছিলেন বহিরাগত আর্য জাতি। অসংখ্য গবেষক ও সাংবাদিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বহু মানুষকে বিশ্বাসী করান সম্ভব হয়েছিল যে ভারতের সভ্যতা বহিরাগত আর্যজাতির দান। অপরপক্ষে স্কুলে পড়ে আমরা শিখতাম মিশরের সভ্যতা নীলনদের দান। ভারতের সভ্যতা সৃষ্টিতে ভারতের নদীর কি কোন ভূমিকাই নেই? এই প্রশ্ন পণ্ডিতদের মাথায় কেন এলোনা?

সিন্ধু নদের উপকূলে মহেঞ্জো-দড়ো তথা হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কার হল। তারপর অধুনা বিলুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরে সরস্বতী সভ্যতা এবং পরিশেষে বোলন নদীর তীরে কাচি সমভূমিতে মেহেরগড় সভ্যতা, যা হরপ্পা সভ্যতা থেকেও ৩০০০ বছর প্রাচীন, আবিষ্কৃত হল। ভারতের সভ্যতার সূচনা ৮৫০০ বছর প্রাচীনকাল থেকে। মেহেরগড় ও হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কার হবার ফল কি হল? ৩৫০০ বছর পূর্বে বিদেশী আর্যরা ভারতে এসে ভারতের সভ্যতা সৃষ্টি করছে— এই তত্ত্বটি অচল টাকায় পরিণত হল। এই তিনটি সভ্যতা থেকে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শন এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত তথ্য অনুসন্ধান করে এবং তাদের মধ্যে অনেক মিল দেখে ভারতের সভ্যতা যে ভারতবাসীরই সৃষ্টি এবং এই সভ্যতার যে ধারাবাহিকতা চলছে তা আমাদের পক্ষে এখন জানা সম্ভব হয়েছে।

(১) মাতৃ অঙ্গরূপে মাতৃপূজা

উত্তরপ্রদেশে সোন নদীর উপত্যকায় ১ নং ব্যাগহরে খনন কার্যের ফলে পাথরের স্তর থেকে ৮৫ সে.মিটার গোল পাথরের ('ring stone') বেদী এবং তার উপরে স্থাপিত মাতৃ অঙ্গরূপের একখণ্ড পাথর আবিষ্কার হয়েছে। মাতৃঅঙ্গ নকশার পাথরটি প্রকৃতির সৃষ্টি, কৃত্রিম নয়। প্রকৃতির সৃষ্টি এই পাথর এখনও এখানে পাওয়া যায় এবং এই অঞ্চলের স্থানীয় লোকেরা আজও গোল পাথরের বেদীর উপর মাতৃ অঙ্গরূপের পাথর স্থাপন করে মাতৃপূজা করে আসছেন। প্রত্নবিজ্ঞানী জে.এম. কিনোয়ার ব্যাগহরের নব্য

প্রস্তর যুগের পাথরের স্তর থেকে আবিষ্কৃত এই নিদর্শনটিকে মাতৃদেবী তত্ত্বের মূল প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্নবিজ্ঞানী ডি.কে. চক্রবর্তী ব্যাগহরে আবিষ্কৃত এই নিদর্শনটিকে ভারতে প্রথম মাতৃ অঙ্গরূপে মাতৃপূজার নিদর্শন বলেছেন ('Baghor I has produced the first upper palaeolithic shrine in India.' –D. K. Chakraborti, *The Oxford Companion of Indian Archaeology*, pp. 45-6)। মাতৃঅঙ্গরূপে মাতৃপূজা আমরা আসামে কামরূপ মন্দিরে প্রচলিত দেখি। প্রশ্ন হল: নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ মাতৃ অঙ্গের পূজার প্রচলন কেন শুরু করেছিল? মনে হয় বিবর্তনের ধারায় নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের আচরণ ধীরে ধীরে পশুর আচরণ থেকে ভিন্ন হতে থাকল। পশু প্রবৃত্তির দাস। বলপূর্বক ভোগে তার বাধা নাই। মানুষের মনে বিচার-বিবেচনা ধীরে ধীরে জন্ম নিয়েছে। পশুর মত, রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মত নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহার করতে বাধা দিতে মাতৃ অঙ্গকে মাতৃদেবীরূপে পূজার প্রচলন মানুষ শুরু করে। মেহেরগড় সভ্যতায় আবিষ্কৃত নারীদেবী মূর্তিই সংখ্যায় বেশি। হরপ্পা সভ্যতায় মাতৃদেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঋগ্বেদ রচনায় আছে ৭জন নারী ঋষির অবদান। বেদে নারীজাতির অপমানের উল্লেখ চোখে পড়েনি। মহাকাব্যে রাক্ষস, দানবদের ধ্বংস করা হয়েছে। রাক্ষসরাজ রাবণ যে পরস্ত্রীদের চুরি করেছে ভোগের উদ্দেশ্যে তাকে বধ করা হল মহাকাব্যে। বধ করা হল নারী অসম্মানকারি দুর্যোধন, দুঃশাসনদের। মনে হয় নারীজাতিকে পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি মাতৃ অঙ্গের মাতৃপূজা প্রচলন করেছিল যে পূজার ধারাবাহিকতা বর্তমানে চলছে। কিন্তু একটি ধর্মমতে নারী 'ভোগ্যবস্তু' এবং 'মূর্তি' পূজা বেদী ঘৃণ্য বস্তু।'

(২) মূর্তি ও বেদী তৈরির সংস্কৃতি

ভারতের ব্যাগহরে আবিষ্কৃত নব্যপ্রস্তর যুগের বেদীর উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। ৭০০০ বছর প্রাচীন সময়কালে তৈরি বেদীর উপর মানুষের মাটির মূর্তি এবং চতুষ্পদ প্রাণীর মূর্তি হল মেহেরগড় সভ্যতার আবিষ্কৃত দুটি মূল্যবান নিদর্শন। এই সভ্যতার খননকার্যের ডাইরেক্টর জে.এফ জারিজ লিখেছেন, 'সাত সহস্রাব্দ সময়কালের মাটির দুটি মানুষের মূর্তি পাওয়া গেছে। সেগুলি খুবই বিশেষ ধরণের। একটি বসা অবস্থায় অন্যটির মাথা নাই। যে বেদীর উপরে মূর্তিটি বসান সেই বেদীর সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছে ছোট ছোট ডিস্‌ক বেদীর চারদিকে এঁটে দিয়ে। সেখান থেকে আর একটি চতুষ্পদ প্রাণীর বিশেষ ধরনের টেরাকোটা (পোড়ামাটির) মূর্তি পাওয়া গেছে।... নব্যপ্রস্তর যুগের স্তর থেকে পাওয়া একটি মূর্তির নিম্নাংশ সহ এই মূর্তিগুলি প্রমাণ করে যে বালুচিস্তানের (অখণ্ড ভারতের অংশ) প্রাচীন সংস্কৃতিতে মানুষ ও প্রাণীর

প্রতিনিধিত্ব আছে।' *J.F. Jarrige, 'Origin of Harappan Civilization and Mehrgarh Excavations' in* D.P. Sharma(ed), p. 97.)

মেহেরগড় খননকার্যের অন্যতম বিশেষজ্ঞ প্রত্নবিজ্ঞানী আলচিন লিখেছেন যে ৭৫০০ বছর প্রাচীন সময়কালের মাটি দিয়ে (হাতে) তৈরি কয়েক সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি মানুষের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। (*Allchin(s), The Birth of Indian Civilization.* p.129)। সুতরাং প্রত্ন প্রমাণ অনুসারে মূর্তি তৈরি শিল্প ৭৫০০ বছর ধরে ভারতে চলছে যদিও ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের জন্য বালুচিস্তান মুসলিম দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বলুচিস্তানে মূর্তি তৈরি শিল্পের অবনতি বা বাতিল হওয়ারই সম্ভাবনা। ভারতে হিন্দুসমাজে চলছে ৭৫০০ বছর ধরে মূর্তি তৈরি শিল্পের ধারাবাহিকতা।

(৩) গ্রিড প্যাটার্নে নগর নির্মাণ

হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টারা যে ঐ অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন তার প্রমাণ হল গ্রিড (grid) প্যাটার্নে মহেঞ্জো-দড়োর নগর নির্মাণ পরিকল্পনা। যদি বিদেশীরা এই সভ্যতার স্রষ্টা হতো তবে সমকালীন পৃথিবীর অন্যদেশের সভ্যতায় গ্রিড প্যাটার্নে নগর নির্মাণ আবিষ্কার হতো। কিন্তু অন্যদেশের সভ্যতায় সে প্রমাণ নেই। এই পদ্ধতিতে নগরের দূষিত বায়ুর অপসারণ ও নির্মল বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। শহরের রাস্তাগুলি সোজাসুজি (যেমন পুব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে) একে অপরকে অতিক্রম করে চলে যেত ফলে নগরের মধ্যে নির্মল বাতাসের প্রবেশ ও দূষিত বাতাসের বহির্গমনের পথ তৈরি থাকত (...'the roads cut each other angles an arrangement that helped the prevailing wind work as a suction pump, automatically clearing the atmosphare'.– *Ency. of Ancient World,* p.121)। গ্রিড প্যাটার্ন পদ্ধতির ধারাবাহিকতা ভারতে আজও চলছে নগর নির্মাণে। একটি উদাহরণ হল ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান হবার ফলে হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। অনেক রেফিউজী কলোনি তৈরি হয়। শ্রীকৃষ্ণপুর রেফুউজী কলোনির (বর্তমানে দমদম পার্ক) নগর নির্মাণে গ্রীড প্যাটার্ন অনুসরণ করা হয়েছে।

(৪) মাতৃদেবী মূর্তি



মহেঞ্জো-দড়োর

মহেঞ্জো-দড়োর সভ্যতার সমসাময়িক কালে মেহেরগড়ে ছোট পোড়ামাটির অনেক মূর্তি আবিষ্কার হয়েছে। প্রত্নবিজ্ঞানী আলচিন লিখেছেন, 'সকলেই সাধারণভাবে একমত যে এগুলি দেবীমূর্তির প্রতীকস্বরূপ ('there is general concensus *that these represented deities.' Allchin.* 136)।

মহেঞ্জো-দড়ো থেকে মাতৃদেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। কতগুলির রূপ খুব শান্ত সুন্দর অন্য কতগুলি দেখতে খুবই ভয়ঙ্কর। প্রাগুক্তগুলি শুভ শক্তি, মা বসুন্ধরার প্রতীক যিনি আমাদের ভরণ-পোষণ করেন, পালন করেন এবং ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলি অশুভ দুষ্ট শক্তি ধ্বংসকারিণী মাতৃশক্তির প্রতীক।



কলকাতা মিউজিয়ামের সৌজন্যে



দৈনিক স্টেটসম্যানের সৌজন্যে

তিনি দুষ্ট শক্তিকে বিনাশ করে আমাদের রক্ষা করেন। স্যার জন মার্শাল (মহেঞ্জো-দড়োর খনন কার্যের ডাইরেক্টর) বলেছেন, ভয়ঙ্কর মূর্তিগুলি কালী মূর্তিরই মূল নমুনা' ('the malignant Kali... these figurines may be taken to be early prototype'.– Marshall:50)। তাহলে জগদ্ধাত্রী ও কালীর উৎস মহেঞ্জো-দড়ো যাঁদের পূজার ধারাবাহিকতা চলছে। সম্ভবত ভয়ঙ্কর রূপের কালী মূর্তির প্রতীকের অর্থ জানার চেষ্টা না করে কোন কোন ব্যক্তি ভারতবাসীদের (সচেতন ভাবেই হোক বা অসচেতনভাবেই হোক) বিভ্রান্ত করতে কালী ও সরস্বতী সম্বন্ধে কুৎসিত বর্ণনা করেছেন যাতে ভারতবাসীর মনে স্বদেশ ও স্বধর্মের প্রতি বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

(৫) দেবতা পশুপতির নিদর্শন



মহেঞ্জো-দড়ো থেকে

মাতৃমূর্তির মত মহাদেবের মূর্তি মহেঞ্জো-দড়ো থেকে পাওয়া না গেলেও মহাদেবের পূর্বরূপ পশুপতির তিনটি ছবি (সীলে অঙ্কিত) পাওয়া গেছে। দুটি ছবি খুবই সুন্দর। একটি ছবিতে পশুপতির মুখ এক, অন্যটিতে তিন। তিনি মূল বন্ধ্যাসনে বসে আছেন। তিনি মহাযোগী। জন মার্শাল এই দেবতার

সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি গবেষণা করে ঘোষণা করেছেন যে ইনি ঐতিহাসিক শিবেরই পূর্বরূপ (....'in most essential aspects historic Siva'– Marshall, V.I,55)। হিন্দুরা যে শিবপূজা করেন তার ধারাবাহিকতা মনে হয় মহেঞ্জো-দড়ো সভ্যতার সময়কালে থেকে। তখন পূজা ও অর্চনা হয়তো হতো। মার্শালের এই মত। তিনি লিখেছেন যে নাগারা যে মূর্তি পূজা করে তা সীলে অঙ্কিত পশুপতি মূর্তিরই মতো। ঋগ্বেদের পূর্ব কালের পূজার খবর জানতে যজ্ঞ ঋষির প্রশ্ন: 'যেকালে সকল দেবতা দেবপূজা করলেন তখন তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেব মূর্তিই বা কি ছিল?' সুতরাং মূর্তিপূজা প্রাক্‌বৈদিক যুগেও ছিল (ঋ১০/১৩০/৩, ১০/১০৪/১০)।



(৬) সরস্বতী নদীকে স্তবস্তুতি থেকে সরস্বতী মূর্তিপূজা

ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্ম একজন পুরুষ প্রতিষ্ঠা করেননি। প্রকৃতির অবদানে এবং ভারতবাসীর ধারাবাহিক শ্রমে সৃষ্টি। মিশরের সভ্যতা যে নীলনদের দান সেকথা আমাদের শেখান হয় কিন্তু উত্তর-পশ্চি ম ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে বোলন, সরস্বতী, সিন্ধু প্রভৃতি নদীর দান সেকথা কেন আমাদের শেখান হতো না? এর পিছনে চতুর স্বার্থগোষ্ঠীর যে তৎপরতা ছিল তা আমাদের প্রায় সকলেরই অজানা। নীলনদের মত সরস্বতী নদীর দানে সৃষ্টি হয়েছিল সরস্বতী সভ্যতা। প্রাচীন ভারতবাসী ছিল প্রকৃতি পূজারী। এখন যেমন তখনও তেমনি তারা নদীকে স্তবস্তুতি করতেন। সরস্বতী নদীর কৃপায় যেমন ধনসম্পদ লাভ হয়েছিল তেমনি জ্ঞানের সাধনায়ও তাদের সিদ্ধি লাভ হয়েছিল। ঋগ্বেদের মত জ্ঞানভান্ডারের সৃষ্টি সরস্বতী নদীরই উপকূলে। ঋষিরা বহু ঋগ্বেদ মন্ত্রে দেবীরূপে সরস্বতী নদীর কাছে স্তবস্তুতি করেছেন। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে প্রকৃতি পূজার প্রচলন ভারতে।

ঋগ্বেদের ঋষিরা সরস্বতী নদীকে 'কল্যাণী' রূপে, 'দানশালিনী' রূপে, 'অন্নশালিনী' রূপে, 'সমৃদ্ধি বিধায়িনী' রূপে স্তুতি করেছেন (ঋগ্বেদ ৬/৬১/৪,৭/৯৬/৩)। সরস্বতী নদী, নদীদেবী, অগ্নি বা ইন্দ্রের মতো ঋগ্বেদের প্রধান দেবী, বাক্ দেবীরূপে পূজিতা। সরস্বতী যে কেবল ধন-সম্পদ-অন্ন দান করতেন তাই নয়, মধুছন্দা ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, 'সরস্বতী... সকল জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন' (ঋ১/৩/১২)। কারণ ঋগ্বেদ সৃষ্টি খুব সম্ভব এই নদীরই উপকূলে অনুকূল পরিবেশে। 'সরস্বৎ' শব্দের অর্থই প্রচুর জল বিশিষ্ট নদী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সরস্বতীর উল্লখ আছে। শিবপুরাণে সরস্বতী শিবের কন্যা। তিনি জলদেবী। তাঁর রঙ সাদা, বসন সাদা, বাহন জলচর হাঁস সাদা, দেবীর আসন জলপদ্ম সাদা। মন্ত্রে উচ্চারণ করি— বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, বিদ্যাস্থানেভ্য। বিদ্যাস্থানও পবিত্র, প্রণম্য। মহাকাব্য

মহাভারতের শুরু সরস্বতীকে বন্দনা করে।' নবকুমার ভট্টাচার্যের মতে, 'জৈন ও বৌদ্ধ দের পূজার আসনেও সরস্বতী অধিষ্ঠিতা।' সরস্বতীর এক নাম শ্রী কারণ তিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে জ্ঞানের আলো জ্বালেন। ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজও ঘরে ঘরে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হয়। যদিও সরস্বতী নদী বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে, কিন্তু রেখে গেছে নদীর দুইকূলে অসংখ্য নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এবং সরস্বতী পূজার ধর্মীয় সংস্কৃতি। ইতিমধ্যে কিন্তু ভারতের সরস্বতী সভ্যতা-ধর্মসংস্কৃতির এই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাটিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা চালাচ্ছিল ধর্মান্তরকরণী শক্তি, কিছু ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবী।

১৮১১ সালে কর্নেল বোডেন নামে জনৈক ইংরেজ একখানি উইল তৈরি করে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললেন, 'তাঁর উইলের বিশেষ উদার উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় শাস্ত্রগুলি যেন সংস্কৃতে দ্রুত অনুবাদ করা হয় যাতে তাঁর দেশবাসীরা (ইংরেজ মিশনারীরা) নেটিভ ভারতবাসীদের খৃষ্টান রিলিজনে ধর্মান্তরিত করতে অগ্রসর হতে পারে। (M.Monier- Williams, *A Sanskrit-English Dictionary,* p.ix: 'The special object of his (colonel Boden's) munificient bequest was to promote the translation of the scriptures... so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian Religion.')।

ভারতবাসীদের ধর্ম বিলোপ করে তাদের খৃষ্টান করার উদ্দেশ্যকে সাহায্য করতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বোডেন অধ্যাপকের একটি পদ সৃষ্টি করে এবং বোডেন অধ্যাপক হন এম. মোনিয়ার-উইলিয়মস্ যিনি ধর্মান্তরকরণ কাজের স্বার্থে ইংরেজী ভাষায় এক সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান তৈরি করলেন। এই অভিধানে সরস্বতী সম্বন্ধে লেখা হল একটি নদীর নাম এবং এর অনন্যতা খুব বিতর্কিত, আবেস্তা গ্রন্থে লিখিত আফগানিস্তানের হরকোইতি নদী, ঋগ্বেদের সিন্ধুই এই নদী এবং কখন কখন মধ্যদেশের ক্ষুদ্র এক নদী।' 'N (name) of a river... of a river whose identity is much disputed, most authorities hold that the name S⁰ is identical with the Avestan Haraquaiti river in Afganistan, but that it usually means the Indus in the RV., and only occasionally the small sacred river in the Madhya-desa'.– Monier-Williams, p.1182). সরস্বতীকে এক অনন্যা নদী না বলে সিন্ধুকেই সরস্বতী নদী বলা হল। ঋগ্বেদে (১০/৭৫/৫-৬) সরস্বতী ও সিন্ধু যে দুইটি ভিন্ন নদী তা সুস্পষ্ট। ইরফান হাবিব ও ফৈজ হাবি বললেন— সরস্বতী আফগানিস্তানের (১) হেলম্যান্ড নদী, (২) এরই নাম সিন্ধু এবং (৩) হরিয়ানা-পাঞ্জাবের এক ক্ষুদ্র নদী।

ড. ইরফান হাবিবের অভিমত আছে তাঁর *সরস্বতী নদী কল্পনায় ও বাস্তবে* পুস্তিকায় যেখানে তিনি উপসংহারে বললেন, 'আমরা এও দেখেছি যে ঋগ্বেদে যখন সরস্বতীকে পরাক্রমশালী বা মহান বলা হয়েছে, তা দিয়ে কখনোই ওই স্রোতস্বিনীকে বোঝানো হয়নি, এমনকি কোনো জাগতিক নদী সম্পর্কে ওই কথাগুলি ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই সরস্বতী নদীর মহাত্ম্য সম্পর্কে যতই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আলোচনা করা হোক না কেন, তা শূন্যগর্ভ ছাড়া কিছুই নয়' (পৃ. ১৮)। তিনি সরস্বতী নদীর জাগতিক অস্তিত্বকে অস্বীকারই করলেন। দেখা যাক সরস্বতী নদীর জাগতিক অস্তিত্বের প্রমাণ আছে না নেই?

ঋগ্বেদে কমপক্ষে ৫০ বার সরস্বতী নদীর নাম আছে (D.P. Sharma (ed.), *Early Harappans* : 241)। ঋগ্বেদে আছে সরস্বতী নদী উপকূলে বসবাসকারী ঐতিহাসিক পুরজাতির নাম। ঋগ্বেদের যুগের অনেক পরে পুরুরাজার অসাধরণ বীরত্বের ঐতিহাসিক কাহিনি আছে সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধে। তাছাড়া, পরভত, পঞ্চজাত জনজাতিরও উল্লেখ আছে ঐ নদীরই উপকূলে। দেবশ্রবা ঋষি সরস্বতী উপকূলে সকল মানুষের গৃহের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেছেন (ঋ৩/২৩/৪)। ঐ নদীর উপকূলে বসবাসকারি 'পঞ্চজাতা' মানুষের সমৃদ্ধির জন্য স্তুতি আছে (ঋগ্বেদ, অনুবাদ ড. দত্ত, পৃ. ৬৯৭)। আমরা কি পণ্ডিত ব্যক্তির মতবাদকে বিশ্বাস করব না প্রমাণের উপর নির্ভর করব?

ড. মুঘল চেলিস্তান মরুভূমিতে ৩০০ মাইল সরস্বতী নদী জরিপ, নিদর্শন আবিষ্কার ও সনাক্তকরণ করেছেন। সরস্বতী নদী জরিপ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে কোন কোন স্থানে সরস্বতী নদী প্রস্থে ছিল ১০ থেকে ১৫ মাইল পর্যন্ত। ড. মুঘল লিখেছেন, হাক্‌রা নদীকে অনেক সময়েই বৈদিক যুগের সরস্বতী নদী সনাক্তকরা হয়েছে ('Hakra river, often identified with the Sarasvati of the Vedic period.'– Mughal in S. P. Gupta, *The Lost Sarasvati*, p.121)। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে সরস্বতীর নাম হক্‌রা, ভারতের রাজস্থানে নাম ঘাগ্গর। সরস্বতী ও সিন্ধু যে একই নদী নয় দুটি ভিন্ন নদী তা জানা যায় ঋগ্বেদ পড়ে। সিন্ধুক্ষীত ঋষি তাঁর ১০/৭৫/৫ সূক্তে সরস্বতী নদীকে এবং ১০/৭৫/৬ সূক্তে সিন্ধু নদকে সম্বোধন করতে দুটি আলাদা সূক্ত রচনা করলেন। যদি সরস্বতী এবং সিন্ধু এক নদী হতো তবে দুটি সূক্তে আলাদা আলাদাভাবে দুই নদীকে সম্বোধন করে প্রার্থনা জানানোর দরকার হবে কেন?

আবার ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় নহুস রাজা (ঋ৭/৯৫/২) এবং চিত্র রাজা (ঋ৮/২১/১৮) সরস্বতী নদী তীরে বাস করতেন কিন্তু ভব্য রাজা বাস করতেন সিন্ধু তীরে (ঋ ১/১২/১)। এসব তথ্য থেকে কি সিন্ধু ও সরস্বতী যে দুই সতন্ত্র নদী তা

মনে হয়না? কোনটি সিন্ধু এবং কোনটি সরস্বতী নদী তা বৈদিক ঋষিরা যে ভুল জানতেন তা মনে করার কারণ আমরা দেখিনা।

সিন্ধু সভ্যতা যেমন ভারতবাসীর গৌরবের বিষয় তেমনি সরস্বতী সভ্যতাও তাদের গৌরবের বিষয়। ভারতবাসীদের এই গৌরবের স্বীকৃতি দিলে ধর্মান্তরকরণীদের তো স্বার্থসিদ্ধি না হবারই কথা। গৌরবহীন জাতিকেই ধর্মান্তরকরণ সহজ। সরস্বতী নদীর মতো দেবী সরস্বতীকে নিয়েও ফিদা হোসেন তৈরি করেছিলেন নগ্ন সরস্বতীর ছবি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সরস্বতী সম্বন্ধে যৌন কবিতা লিখলেন (আ.পত্রিকা, ২৮.৩.২০০৫)।

বরপুত্র

বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে / টেনে
চোখ মারি / হে বীণাবাদিনী, তুমিও তো নারী,
ক্ষমা করো এই / বাক-ব্যবহার...।
নিঃশব্দ, নিবিড়
রাত্রে, আমি বসে আছি, আমার সামনে একটি মাটির
মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। এক সময় সর্বাঙ্গে
শিহরণ হল। কী অপূর্ব সুন্দর মুখ এই শ্বেতবসনা
রমণীর। আয়ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠ, ভরাট, বর্তুল দুটি,
স্তন। সরু কোমর, প্রশস্ত উরুদ্বয়। .... তছনছ হয়ে
যেতে লাগল আমার কৈশোর, জেগে উঠল পুরুষার্থ,
অল্প অল্প শীতেও উষ্ণ হয়ে উঠল শরীর।
.... চোরের
মতন সতর্ক ভাবে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে
আমি হাত রাখলাম দেবী মূর্তির বুকে।..... সেই
কুচযুগে আমার আঙুল, আমার শরীর আরও
রোমাঞ্চিত হল, কান দুটিতে আগুনের আঁচ। আমি
প্রতিমার ওষ্ঠ চুম্বন করলাম, আমার জীবনের প্রথম
চুম্বন।”.....।

ভারতের ধর্ম, সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণার মনভাব তৈরির চেষ্টা যে ধর্মান্তরকরণীরা করছেন, এই কাজের উদ্দেশ্য তাছাড়া আর কি হতে পারে? যদি তা না হতো তবে অন্যান্য বিদেশী ধর্মের উপাস্যদের নিয়েও সরস্বতীর মত নগ্ন চিত্র ও

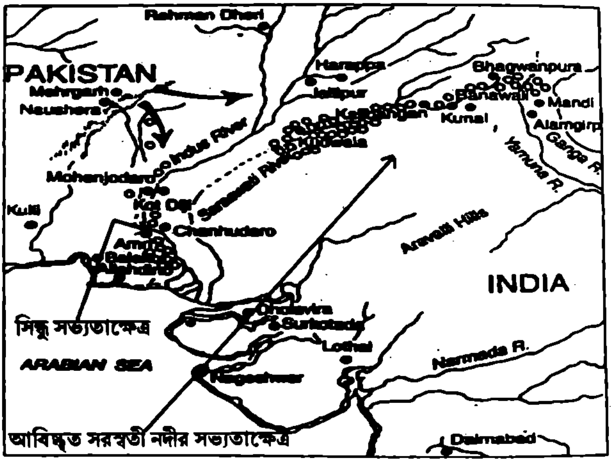
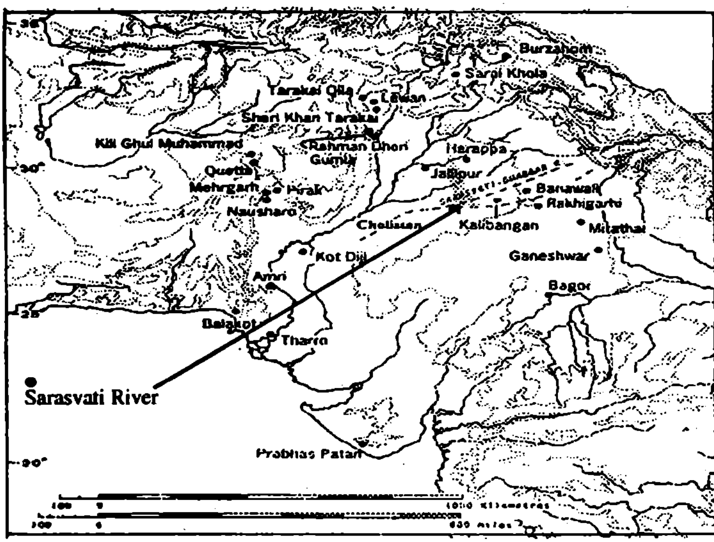


Fig. 2: Major sites of the Indus-Sarasvati Civilization.

Chart-2

Total No. of Harappan Sites on Sarasvati-Hakra	–	1074
Total No. of Harappan Sites on Sarasvati-Hakra in Pakistan	–	426
Total No. of Harappan sites on Sarasvati-Hakra in India	–	648

(ডি.পি. শর্মা ও এস.পি. গুপ্তর সৌজন্যে)

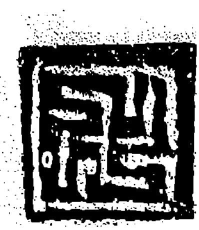


আলচিনের দেওয়া মানচিত্রে সরস্বতী ও সিন্ধু দুই ভিন্ন নদী

যৌন কবিতা তৈরি হতো। তা কিন্তু হয়নি। তাহলে উদ্দেশ্য কি স্বদেশী ধর্মের বিকল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নয়? প্রত্নবিজ্ঞানী ড. বি.বি. লাল হাবিবদের মতকে 'কিছু ভ্রান্ত মত ('Some Erroneous Views') বলে মন্তব্য করেছেন। B.B. Lal, 'Archaeology of Sarasvati' in D.P. Sarma & Sharma (ed.), *Early Harappans* pp.253-67)।

ভারতবাসীদের ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজনে সৃষ্ট মনিয়ার-উইলিয়ম্‌সের অভিধানখানি ১৮৫১ সালে যখন প্রকাশিত হয় তখন উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্য (স্যাটেলাইট থেকে ছবি, নাসা, ইসরো, দূর অনুভব প্রভৃতি) নিয়ে সরস্বতী নদীর অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি। ড. বি.বি. লাল, ড. রফিক মুঘল, এম.কে. পুরি, বি.সি. ভার্মা ও অন্যান্য প্রত্নবিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির সাহায্যে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি ও গতিপথের উভয় তীরে ১০৭৪টি নগর সভ্যতা ক্ষেত্র সনাক্ত করে মানচিত্র তৈরি করে দেখিয়েছেন সরস্বতী ঋগ্বেদ বর্ণিত ভারতেরই এক প্রাচীন গুণসম্পন্ন নদী। প্রাচীন ঋষিরা এই নদীর তীরে যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতি করতেন। সরস্বতীর দেবীমূর্তি পূজা পরবর্তীকালে শুরু করেছিলেন প্রকৃতিপূজারী ভারতবাসী। বর্তমানে হিন্দুর ঘরে ঘরে সরস্বতী পূজা হয়।

(৭) স্বস্তিক


জন মার্শালের সৌজন্যে

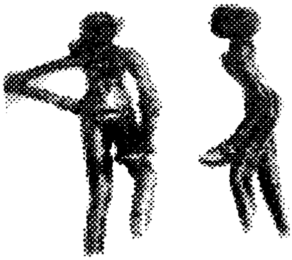
স্বস্তিক শুভ, মাঙ্গলিক, পবিত্র ও সৌভাগ্যের চিহ্ন। মহেঞ্জো-দড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত বহু স্বস্তিক ছবি স্যার জন মার্শালের গ্রন্থে আছে। এগুলি সীলে অঙ্কিত ছবি। মঙ্গলগীত যারা গাইত তাদেরও স্বস্তিক বলা হত। যযুর্বেদের পঞ্চ স্বস্তিমন্ত্রে (২৫/১৯-১৯) স্বস্তিক ব্যক্ত। জৈনদের ২৪টি শুভ চিহ্নের মধ্যে একটি স্বস্তিক। হরপ্পাসভ্যতা থেকে উৎপত্তি স্বস্তিক চিহ্ন বেদ, মহাকাব্য, পুরাণে এবং বর্তমান হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতিতে প্রচলিত।

(৮) শঙ্খ


জন মার্শালের সৌজন্যে

কেবল স্বস্তিকা নয় হিন্দু ধর্মের অঙ্গ অনেকগুলি শঙ্খ পাওয়া গেছে মহেঞ্জো-দড়ো থেকে। ঋগ্বেদে শঙ্খের শব্দের উল্লেখ আছে (ঋ১/১১২/১)। গীতায় শঙ্খ বাদ্যের কথা আছে (১/১২/১৬)। শুভ কর্মে হিন্দুরা শঙ্খ বাজান। শঙ্খ প্রকৃতির সৃষ্টি। হিন্দুর ধর্মের শঙ্খ বাজানোর ধারাবাহিকতা হরপ্পা সভ্যতার সময় কাল থেকে চলছে।

(৯) শাঁখা ও সিঁদুর


সমস্ত বাহুতে বালা (হরপ্পীয় মূর্তি)

রাজস্থানে কালিবঙ্গা সংগ্রহশালায় সংগৃহীত ২১নং দ্রব্যটি 'শাঁখা' ('shell broken bangles')। অভিধানে 'shell' শব্দের অর্থ শঙ্খ। আজও রাজস্থানের অনেক নারীরা সমস্ত বাহুতেই বালা পরেন। এই রীতির উৎপত্তি হরপ্পা সভ্যতা থেকে; মহেঞ্জো-দড়োতে বালাপরা নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।


সিঁথিতে সিঁদুরের মত চিহ্ন (হরপ্পীয় মূর্তি)

(১০) ঘরের দেয়ালে কুলুঙ্গিতে প্রতিমা

হিন্দুর ঘরে ঠাকুর ঘর থাকে। মহেঞ্জো-দড়োর ঘরের 'কুলুঙ্গিতে প্রতিমা' পাওয়া গেছে (Mohenjo-Daro, v.3, SD Area, Pl XVII,a)। 'অর্চনা' ও 'পূজা' করার উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে (১০/১০০/৩, ১০/১৩০/৩)। মূর্তি তৈরি মানুষের আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্টি। সেই আকাঙ্ক্ষার পিছনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ব্যক্তিকে স্মরণীয় করে রাখা, পূজা 'অর্চনা' করার মানসিকতা থাকতেই পারে। দ্বিতীয়ত, এই ধর্ম ব্যক্তিগত। প্রত্নবিজ্ঞানী ধবলিকারের মন্তব্য 'হরপ্পার ধর্ম যেমন ব্যক্তিগত আজকের হিন্দু ধর্মও তেমনি' (.... 'the Harappan religion being as individualistic as Hinduism is today'– Dhabalikar: 58)। হিন্দুধর্ম ব্যক্তিগত হওয়াই তাদের বিনাশের কারণ হবে। সকলে এক হতে পারলে আত্মরক্ষা সম্ভব। বর্তমান হিন্দুরা ভারতের আদি ধর্মাবলম্বী। সরকারিভাবে সাম্যনীতির অভাবে হিন্দু ও হিন্দুধর্ম ক্ষয়িষ্ণু।

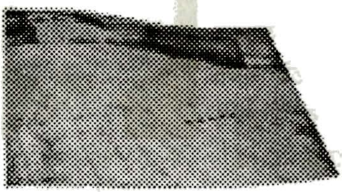
(১১) যজ্ঞ বেদী

১৬ লক্ষ বর্গ কিমি এলাকায় বিস্তৃত প্রাচীন পৃথিবীর বৃহত্তম হরপ্পা সভ্যতার কালি-বঙ্গা, লোথাল, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে যজ্ঞবেদী আবিষ্কৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে আছে অসংখ্যবার যজ্ঞ শব্দ। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটিতেই আছে 'যজ্ঞ' শব্দ: 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্' (ঋ ১/১/১)। সকল মঙ্গল বা কল্যাণ কর্মকে ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ বলা হয় যেমন ব্রহ্ম যজ্ঞ (জ্ঞানের জন্য), নৃযজ্ঞ (অতিথি সেবা), ভূতয় যজ্ঞ (প্রাণী সেবা) প্রভৃতি। যজ্ঞ ঘরের মধ্যে ও বাইরে অনুষ্ঠিত হতো। লোথালে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য বড় আকারের যজ্ঞবেদী পাওয়া গেছে। এখনও হিন্দুর ঘরে ও বাইরে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। নদিয়ার পলাশিতে প্রতিবছর বিশ্বশান্তির জন্য যজ্ঞ

করা হয় অষ্টমীর দুর্গাপূজায়। অনেক আশ্রমেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়। প্রত্নদিদর্শন অনুসারে হিন্দুদের যজ্ঞ পাঁচ হাজার বছর ধরে চলছে।

(১২) হরপ্পা যুগের জমি-চাষ পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত

কালিবঙ্গা ছিল প্রাচীর ঘেরা নগর। নগরের বাইরে আবিষ্কৃত হয়েছে খুবই সুবিদিত হরপ্পা যুগের লাঙ্গল দিয়ে চাষকরা কৃষিজমি। তখন যে পদ্ধতিতে চাষ হতো বর্তমানেও পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি জায়গায় সেই পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। ('An outstanding discovery was a ploughed field showing a cross-grid of furrows'............ sorce: Kalibanga Museum)।



প্রাচীন হরপ্পীয় চাষ (কালিবঙ্গান)

(১৩) হরপ্পা শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা

মহেঞ্জো-দড়োতে আবিষ্কৃত 'পশুপতির' মাথায় যে মুকুট 'অবিকল তেমন প্রতীক দেখা যায় বারহুত বা সাঁচীর শিল্পালয়ে' (কৃষ্ণেন্দু দাস: *বিলুপ্ত সরস্বতী* ঃ ১০২) 'পশুপতি' যে বেদীতে বসে আছেন সেই বেদী সামনে আছে হরিণ। বুদ্ধের সিংহাসনের (ধর্মচক্র) সামনে আছে হরিণ যে সিংহাসনে বসে বুদ্ধ প্রথম উপদেশ দেন। মধ্যযুগের মহাদেবের মূর্তির হাতে হরিণ শাবক থাকতে দেখা যায়। হরপ্পার এই মহাযোগীর দ্বারা পরবর্তী যুগে কিছু শিল্প প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হয়।

(১৪) গৌরীপীঠ

গৌরীপীঠ হল সৃষ্টিতত্ত্ব— শিব ও গৌরীর মিলিত রূপ। সব হিন্দুরা এইরূপেই সৃষ্টি শক্তির পূজা করেন। মহেঞ্জো-দড়োর সভ্যতা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে গৌরীপীঠ মূর্তি যা আছে স্যার জন মার্শালের গ্রন্থে। (Marshall: v.3)



জন মার্শালের সৌজন্যে

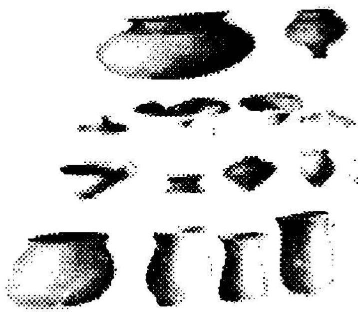
(১৫) মাতৃদেবী মূর্তির শিল্পরীতির ধারা

মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত মাতৃদেবীমূর্তির শিরোভূষণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির, মোচা আকৃতির গাল, গলায় হার, কানে অলঙ্কার। 'একইরকম মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে দুহাজার বছর পরবর্তী মৌর্য রাজত্বকালীন প্রত্নকেন্দ্র থেকে' (কৃষ্ণেন্দু: ১০২)।

(১৬) মেহেরগড় ও হরপ্পার সভ্যতার নানা জিনিসের আজও ব্যবহার চলছে

মেহেরগড় ও হরপ্পার মানুষ যে সব জিনিস আবিষ্কার করে ব্যবহার করতেন সেইসব অনেক কিছু যে আজও আমরা ব্যবহার করি সে কথা আমাদের প্রায় অজানা। (ক) সীল (seal) তৈরি শুরু মেহেরগড়ে, হরপ্পার মানুষ অতিসুন্দর সীল বানাতেন, বর্তমানে আমরা সীল ব্যবহার করি। (খ) হরপ্পার মানুষ দশমিক সংখ্যা আবিষ্কার করলেন। আজও আমরা তা ব্যবহার করি। (গ) হরপ্পা যুগে আবিষ্কার দু-চাকার গাড়ি, বর্তমানে দু-চাকার ঠেলাগাড়ির ব্যবহার চলছে। (ঘ) মাছ ধরার বঁড়শি তৈরি হতো কলিবঙ্গানে— বর্তমানেও তা ব্যবহার হয়। (ঙ) হরপ্পায় কালিবঙ্গানে তুলার চায় হতো, তুলা ও পশম-বস্ত্র ব্যবহার হতো। ঋগ্বেদে বস্ত্রবয়নের উল্লেখ আছে। (চ) পোড়ামাটির অলঙ্কারে হলুদ রঙ করা হতো মেহেরগড় সভ্যতায়। সরস্বতী সভ্যতার মানুষ ৬০০০ বছর প্রাচীন কালে গেরুয়া রঙ ব্যবহার করতেন (M.R. Mughal: 108)। ত্যাগ ও শোকের প্রতীক হলুদ রঙ। ৭১২ সালে মঃ কাসিম সিন্ধুরাজা দাহিরের শিরচ্ছেদ করলে 'ব্রাহ্মণেরা শোকে মস্তক মুন্ডন ও হলুদ বস্ত্র পরেন' (*চাচ-নামা*)। এই ধারা চলছে। স্বামী বিবেকানন্দ গেরুয়া কাপড় পরতেন। গেরুয়া/হলুদ প্রাচীন কাল থেকে হিন্দুর পবিত্র রঙ।





(ছ) কালিবঙ্গা সংগ্রহশালার তালিকায় ১ নম্বরেই আছে খুবই সুন্দর কারুকার্যকরা চকচকে পোড়া মাটির ও শ্বেতবর্ণের পাথরের পুঁতির মালা ('garland of faience steatite beads')। গলায় মালা পরা ও পরানোর রীতি হরপ্পা সভ্যতায় প্রচলিত ছিল। আজওতো দেবদেবী, বরকনে, সভাপতির গলায় মালা পরান হয়। ঐ তালিকার ৩ ও ৫ নং এ আছে মূল্যবান পাথরের ও পোড়ামটির পুঁতির মালা। পাওয়া গেছে ঠিক যেন পোড়ামাটির সুন্দর ধুনুচি ও প্রদীপ রাখার স্ট্যান্ড (২৩ নং), পাথরের শিল-নোড়া কালিবঙ্গা ও মহেঞ্জো-দড়ো থেকে পাওয়া গেছে। রঙকরা সুন্দর রকমারি পোড়ামাটির বালা (২৬ ও ২৭ নং), রুটি তৈরির তাওয়া পাওয়া গেছে। আমাদের মনে হয় হরপ্পা

সভ্যতার ভারতকে আজও আমরা ঘরে ঘরে দেখতে পাবো যদি কমপক্ষে ২৮টি বিখ্যাত হরপ্পা সভ্যতা ক্ষেত্র আমরা খুঁজে দেখি। *

(১৭) মা দুর্গার কল্পনা

শেষ করার আগে বৈদিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার আর একটি বিখ্যাত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হল।

ইয়ং যা নীচ্যর্কিণী রুপা রোহিণ্যা কৃতা।
চিত্রাব প্রত্যদর্শযত্য ১ ন্তর্ দশসু বাহুষু।।
ঋ. ৮/১০১/১৩

She yonder, bending down, rich in rays, clothed
in red hues;
Is seen, advancing as one wonderful, amid the ten
sorrounding arms. (R. VIII. 101-13).

লাল রঙের উজ্জ্বল রশ্মিপ্রভায় আবৃতা তিনি ঝুঁকে নীচে ঐ দূরে।

অগ্রসর হচ্ছেন চতুর্দিকে দশ বাহু মধ্যে তিনি বিস্ময়কর এক অপূর্ব রূপ ধরে।

দশ বাহুর মাঝে দেবী দুর্গাকে কি মনে পড়ে না এই শ্লোকটি পড়ে? দশভূজা মা দুর্গার ভাবনা কি ঋগ্বেদ দেয়নি যে দুর্গাকে বাঙালিরা পূজা করেন?

উল্লেখ করতে ভুলে গেছি মেহেরগড়ে নব্যপ্রস্তর যুগে আবিষ্কার হয়েছে অগ্নিবেদী, হরপ্পার সভ্যতা ক্ষেত্রগুলি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে যজ্ঞবেদী, ঋগ্বেদের আছে যজ্ঞের মন্ত্র। আজও সেই মন্ত্র পাঠ হয়।

আমরা ভারতবাসীর ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার জানার জন্য গবেষণার সূচনা করেছি এই আশায় যে অন্যান্যরা এই গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং স্বদেশী ধর্ম-সংস্কৃতি-সভ্যতাকে রক্ষা করবেন। স্মর্তব্য, পৃথিবীর অনেক দেশের প্রাচীন ধর্ম সংস্কৃতি ধর্মান্তরকরণীরা বিনাশ করেছে।

---

* ক্ষেত্রগুলির নামের জন্য দেখুন D.K. Chakraborty, *The Oxford' Companion to Indian Archaeology*. p.148। কৃষ্ণকান্ত সরকার, *প্রত্নতত্ত্বের আলোতে ভারতের সভ্যতা*, পৃ. ২২-২৩

রহস্যাবৃত সুভাষচন্দ্র



ডঃ রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের কথা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আধুনিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নাম। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৯৭ সালের তেইশে জানুয়ারী কিন্তু তাঁর মৃত্যু কত সালে, কোথায় এবং কি কারণে ঘটেছিল, তা আজও আমাদের অজানা। অসংখ্য মানুষ আজও বিশ্বাস করে যে নেতাজী জীবিত আছেন এবং তিনি একদিন আত্মপ্রকাশ করবেন।

টোকিও থেকে তেইশে আগস্ট, ১৯৪৫ সালে প্রচার করা হয় যে নেতাজী সুভাষ ঐ বছরেই ১৮ই আগস্ট একটি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এর পরেই তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের আমজনতা বিষয়টির উপর তদন্ত দাবী করে। যার ফলে ১৯৫৬ সালে জহরলাল নেহরুর আমলে শাহ্ নওয়াজ কমিটি এবং ১৯৭০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে খোসলা কমিশন সুভাষচন্দ্রের ১৯৪৫ সালে হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান শুরু করে। দুটি অনুসন্ধান-সংস্থাই জানায় যে সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালে ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনাতেই মারা গেছেন অর্থাৎ টোকিও থেকে প্রচারিত খবরটি সর্বাংশে সত্য, যেন ঐ খবরটিকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্যই সংস্থা দুটির জন্ম হয়েছিল।

দুটি রিপোর্টেই প্রচুর অসঙ্গতি, অসংখ্য গোঁজামিল থাকায় ভারতের জনমত একটি পূর্ণাঙ্গ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীতে সোচ্চার হয় যার ফলশ্রুতি হিসেবে জাস্টিস মনোজ মুখার্জী কমিশনের জন্ম এবং ১৯৯৯ সাল থেকে যাত্রা শুরু।

এই কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি ছিল যথাক্রমে—

(ক) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস মৃত না জীবিত;

(খ) যদি মৃত হ'য়ে থাকেন, তাহলে তাঁর মৃত্যু বিমান দুর্ঘটনায় কি না, যেমন বলা হয়েছে;

(গ) জাপানী মন্দিরে রাখা চিতাভস্ম নেতাজীর চিতাভস্ম কি না;

(ঘ) তিনি অন্য কোনওভাবে অন্য কোথাও মারা গেছেন কিনা, তাহলে কবে এবং কি ভাবে;

(ঙ) যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায়।

কমিশন ভারতে এবং বিদেশে অধিবেশন করেছে এবং কলকাতা ও নিউ দিল্লীর অধিবেশনে স্টেটাস রিপোর্ট বার করেছে। কমিশন ঐ স্টেটাস রিপোর্ট গুলির মাধ্যমে নিয়মিত তার কাজের খতিয়ান প্রকাশ করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছেও ঐ রিপোর্ট নিয়মিত পাঠানো হয়েছে। মুখার্জী কমিশনের ফাইনাল রিপোর্ট তিন ভল্যুমে পেশ করা হয়েছে, ভল্যুম ওয়ানে অনুসন্ধান দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে কমিশন তার বক্তব্য পেশ করেছে। দুটি স্বতন্ত্র ভল্যুমে (Volumes II A ও II B) ভারত সরকারের কাছে পাঠানো সমস্ত স্টেটাস রিপোর্টগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০০৫ সালের আটই নভেম্বর তারিখে কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করে। দুর্ভাগ্যবশত: ভারত সরকার মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হয়নি, তাই রিপোর্টটি তারা খারিজ করে দিয়েছে।

ভারতের আপামর জনসাধারণ আজও জানে না জাস্টিস মনোজ মুখার্জী তাঁর রিপোর্টে কি বলেছেন। বহু মানুষ আজও জিজ্ঞাসা করে— "আচ্ছা, নেতাজী কি সত্যি সত্যিই প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছেন?"

আমি উপরোক্ত কমিশনের সঙ্গে একজন deponent হিসাবে যুক্ত ছিলাম। কলকাতার মহাজাতি সদনে কমিশনের অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত হয়ে দেখেছি আজও অসংখ্য মানুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামে উদ্বেল হয়ে ওঠে, আজও তাঁর সম্বন্ধে মানুষের কৌতুহলের সীমা নেই, অধিবেশন শেষে বেরিয়ে এসে দেখেছি মহাজাতি সদনের অ্যানেক্স ভবনের বাইরে অপেক্ষমান অগুনতি মানুষ, যাদের মুখে একটাই প্রশ্ন— "জজ সাহেব আজকে কি বললেন?"

মুখার্জী কমিশনের সফর-সঙ্গী হয়ে রাশিয়া যাবার সুযোগ হয়েছিল। সেখানেও কমিশনের অধিবেশন হয়েছে। যে সমস্ত রাশিয়ান গবেষক অতীতে বিভিন্ন জায়গায় ১৯৪৫ সালের পরেও নেতাজীর রাশিয়ায় অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন, তাঁরা কমিশনের সামনে আশ্চর্যজনক ভাবে সে কথা অস্বীকার করেছেন। একজন তো রাশিয়ার বাইরে চলে গেলেন, টার্কিতে গিয়ে বসে রইলেন, কমিশন তাঁকে ধরতেই পারল না, তিনি ধরা ছোঁওয়ার বাইরেই থেকে গেলেন। কমিশন মস্কোতে, সেন্ট পিটার্সবার্গে এবং সাইবেরিয়ার ওমস্কে গেছে যদি কিছু তথ্য পাওয়া যায় সেই আশায়। কিন্তু সর্বত্রই এক অদ্ভুত অনীহা দেখা গেছে। আসলে ভারত সরকারের তরফ থেকে রাশিয়ার কাছে কোনও অফিশিয়াল অনুরোধ যায় নি এ ব্যাপারে, তাই মুখার্জী কমিশনকে রাশিয়া কোনও তথ্য সরবরাহ করেনি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত।

সত্যিই তো, তাদের তো কোনও বাধ্য বাধকতা ছিল না এ ক্ষেত্রে।

আমার এই রচনা, 'রহস্যাবৃত সুভাষচন্দ্র' দেশবাসীকে কিছু তথ্য সরবরাহ করার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস। মুখার্জী কমিশন সত্যানুসন্ধানের যে কাজটি শুরু ক'রে দিয়ে গেছে, আশা করবো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্রের উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি পদে পদে বাধা, অসহযোগিতা আর ভ্রূকুঞ্চন, যদিও আমার থিসিস তাঁর মৃত্যু বা অন্তর্ধান-সম্পর্কিত বিষয় ছিল না।

তরুণ প্রজন্ম যদি মুখার্জী কমিশনের আরব্ধ কাজটি এগিয়ে নিয়ে যায়, সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তারা সত্যে উপনীত হবেই এবং সেই সত্যের প্রতিষ্ঠাই হবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রতি দেশবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ।

নমস্কারান্তে
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৭০০০১৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

"এই নশ্বর জগতে, সব কিছুরই ধ্বংস হয় এবং ধ্বংস হবে, কিন্তু আদর্শ এবং স্বপ্ন ধ্বংস হয় না। একটি ভাবের জন্য একজন ব্যক্তি প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু সেই ভাবই তার মৃত্যুর পরে হাজার জীবনের মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠবে। এই ভাবেই বিবর্তনের চাকা চলতে থাকে . . . দুঃখ ভোগ ও ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে না গিয়ে পৃথিবীতে কোন আদর্শই এ পর্য্যন্ত রূপায়িত হয় নি।"—নেতাজী

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর স্বাধীনতা সংগ্রাম এক কল্পকাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর, যার শেষটা আজও রহস্যাবৃত। তিনি বলেছিলেন– "স্বদেশ সেবা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিনি, স্বরাজ লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই আমার জীবনের তপস্যা, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান"।

বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন—

'বহু শতাব্দী ধরে বিদেশী শত্রু ভারতের সীমানা পেরিয়ে এদেশে হামলা করেছে— পরস্পরের মধ্যে বিবদমান রাজশক্তিদের হতবল করেছে। সারাদেশকে অধীনতার অপমানে জর্জরিত করেছে। এই প্রথম ভারতের সন্তান ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য প্রচন্ড শক্তির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছিলেন— সে কথা ভোলবার নয়, পরে অবশ্য কি হল জানা নেই—এই বীর সন্তান ভারতগগনে উল্কার মত আবির্ভূত হয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে গেলেন সেটার ইতিহাস জানা নেই— নানা লোকে নানা কথা বলে— এ বিষয় অনেকটা আন্দাজী। আমার মনে হয়, সুভাষ বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই দেশে ফিরে আসতেন— তাকে যে বলে তিনি নির্যাতন এড়িয়ে আত্মগোপন করে আছেন সেটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।'

সুভাষ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে কোথায় হারিয়ে গেলেন, আজও এই প্রশ্ন প্রতিটি দেশ প্রেমিক ভারতবাসীর অন্তরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। আজও প্রতিটি ভারতবাসী মনে করে সুভাষ চন্দ্র জাতীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকলে ১৯৪৭ সালে ভারতমাতা ত্রিখন্ডিতা হতেন না। যাঁর সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল, ভীত, সন্ত্রস্ত ইংরেজ আর কালক্ষেপ না করে তড়িঘড়ি ক্ষমতা হস্তান্তর করে এদেশ থেকে বিদায় নিয়েছিল, তাঁর অন্তর্ধান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য জানবার অধিকার আমাদের আছে।

১৯৫২ সালে তখনকার প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ঘোষণা করেছিলেন—

'The question of Bose's death is settled beyond doubt' অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন যে বোসের মৃত্যু নিয়ে কোনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এবার একটু পেছনে যাওয়া যাক। ১৯৪৫ সালের ১৫ই আগষ্ট জাপান ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির কাছে সারেন্ডার করেছিল। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে সুভাষ চন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য অক্ষ শক্তির সাহায্য নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় অক্ষ শক্তি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। সুতরাং 'enemy's enemy is a friend' এই নীতি অনুযায়ী তিনি প্রথমে জার্মানী এবং পরে জাপানের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে গেলে ভারতের একার চেষ্টায় হবে না, অন্য কোনও শক্তির সাহায্য প্রয়োজন। প্রথমে তিনি রাশিয়ার দরজায় করাঘাত করেছিলেন। তখনও রাশিয়া মিত্র শক্তিতে যোগদান করে নি। কিন্তু রাশিয়া তার আভ্যন্তরীণ সমস্যায় তখন জর্জরিত। তাই সুভাষ চন্দ্র রাশিয়া থেকে জার্মানী যান, তার পর ১৯৪৩ সালে রাসবিহারী বসুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে আসেন পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে।

জাপ বাহিনী এবং স্বাধীন বার্মার সৈন্য বাহিনীর সাথে মিলে এক সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্য্যন্ত ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীর অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিল, তাঁদের জ্বলন্ত দেশ প্রেম এই অসম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় নি। জাপানের উপর প্রচন্ড বিমান আক্রমন শুরু হয়, ফলে সে দেশের যে সব বিমান বার্মার প্রতিরক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল, সে গুলি জাপান নিজের প্রয়োজনে তুলে নিতে বাধ্য হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ রেঙ্গুনের দিকে চলে আসে। পরিস্থিতি অনুকূল নয় দেখে বার্মার জাতীয় বাহিনী আত্মরক্ষার্থে বৃটিশের সঙ্গে রফা করে, ১৯৪৫ এর চব্বিশে এপ্রিল নেতাজি রেঙ্গুন ছেড়ে সিঙ্গাপুরের দিকে রওনা হন। এদিকে ভারতে লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের ২৫ শে জুন সিমলায় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন। নেতাজী বুঝতে পেরেছিলেন, যে, ইংরেজ এবার আপোষ প্রস্তাব দেবে এবং তাতে শর্ত থাকবে দেশ ভাগ। তিনি সিঙ্গাপুরের আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে ঐ আপোষ প্রস্তাব মেনে না নেবার জন্য ভারতের নেতাদের কাছে আবেদন জানালেন।

১৬ই আগস্ট নেতাজী ব্যাংককে এসেছিলেন। ১৭ই আগষ্ট সহকর্মী এস এ আইয়ার, দেবনাথ দাস, কর্নেল প্রীতম সিং, অ্যাডজুট্যান্ট আবিদ হাসান, কর্নেল হবিবুর রহমান এবং জাপানীদের তরফে জেনারেল ইসোদা, নেগিচি, হাচিয়া ও

কর্নেল সাকাইকে সঙ্গে নিয়ে নেতাজী সাইগনে আসেন। সেখান থেকে বিমান যাত্রা করেন অজানার উদ্দেশ্যে। ইসোদা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে টোকিও গামী বিমানটিতে একটি মাত্র আসন খালি আছে। নেতাজীর সহকর্মীরা কেউই সঙ্গে যেতে পারবেন না। পরে অবশ্য তাঁর অনুরোধে আর একটি আসনের ব্যবস্থা হয়েছিল, যে আসনে হবিবুর রহমান জায়গা পেয়ে নেতাজীর সহযাত্রী হয়েছিলেন। ১৭ই আগষ্ট স্যালি বম্বার নামক জাপানী যুদ্ধ বিমানটি সাইগন থেকে উড়ে চলে যায়। এর পরের ঘটনাবলী রহস্যাবৃত। নেতাজীর সহকর্মী কর্নেল প্রীতম সিং যিনি সিঙ্গাপুর থেকে সাইগন পর্য্যন্ত নেতাজীর সহযাত্রী ছিলেন, তিনি শাহনওয়াজ তদন্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দান কালে বলেছিলেন, যে ১৭ই আগষ্ট সাইগন বিমান ঘাঁটিতে নেতাজীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন হয়েছিল। তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জাপানী অফিসারেরা তাঁকে কোনও এক অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে,

'They are taking me to an unknown destination'

নেতাজী তাঁকে বলেছিলেন।

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্ট জাপানী সংবাদ সংস্থা ডোমাই নিউজ এজেন্সী একটি খবর প্রচার করে, যে খবরটি টোকিও রেডিও থেকে ব্রডকাস্ট করা হয়। বলা হয় যে, অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান মিঃ বোস ১০ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর ছেড়ে জাপান সরকারের সাথে আলোচনার উদ্দেশ্যে টোকিও অভিমুখে বিমান যাত্রা করেন। ১৮ই আগষ্ট বেলা দুটোর সময় তাইহোকু বিমান বন্দরে ঐ বিমানটি ভেঙে পড়ার কারণে তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। জাপানের একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়। তিনি ঐ দিনই মধ্য রাতে মৃত্যু বরণ করেন।

পরদিন অর্থাৎ ২৪শে আগষ্ট দেশের অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন সংবাদ পত্রে ঐ খবরটি প্রচারিত হয়। টোকিওতে বসবাসকারী ভারতীয়রা নেতাজীর মৃত্যুর খবরটি বিশ্বাস করতে পারে নি। খবরে প্রকাশ হয়েছিল যে, হবিবুর রহমান নাকি নেতাজীর মরদেহ টোকিও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাপানীরা যে কফিনের ব্যবস্থা করেছিল, সেটা ছিল ছ'ফুট লম্বা। বিমানে ওঠানো সম্ভব ছিল না। অতএব তাঁর মর দেহ তাইহোকুতেই দাহ করা হয়, ২২শে আগষ্ট তারিখে। এর পর হবিবুর রহমান নাকি তাঁর চিতাভস্ম টোকিওতে নিয়ে যান, যেখানে রেনকোজি মন্দিরে একটি ভস্মাধারে সেই চিতাভস্ম রাখা হয়। যেহেতু টোকিওতে হবিবুরের আগমন এবং উপস্থিতি গোপন রাখা হয়েছিল, ভারতীয় জনমানসে পুরো ব্যাপারটি একটি প্রশ্ন চিহ্ন রেখে দেয়। ঘটনাটি অবিশ্বাস করার এটাই প্রথম কারণ।

দ্বিতীয়তঃ- টোকিওর ভারতীয় ছাত্র সমাজ জানতে চেয়েছিল যে, নেতাজীর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম কখন এবং কোথায় সম্পন্ন হবে। তাদের জানানো হয় যে, সমস্ত ভারতীয় জনগণকে যথাসময়ে সে খবর দেওয়া হবে, কিন্তু আশ্চর্য জনক ভাবে তারা কয়েক দিন বাদে জানতে পারে যে দু'দিন আগেই ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়ে গেছে।

তৃতীয়তঃ- নেতাজীর মৃত দেহের কোনও ছবি নেওয়া হয় নি।

চতুর্থতঃ- তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, যা তাঁর সনাক্ত করণে সাহায্য করত, দেখা যায় নি।

পঞ্চমতঃ- নেতাজীর সহযাত্রী কর্নেল হবিবুর রহমান নিজের হাতে কিছু ক্ষত চিহ্ন দেখিয়েছিলেন, সে চিহ্ন অন্য কোনও ভাবেও হতে পারে। তিনি যাই বলুন, তাঁর হাতের কিছু পোড়া দাগ নেতাজীর সর্বশরীর ঝলসে যাওয়া প্রমান করে না। একটা ব্যাপার সব থেকে অদ্ভুত মনে হয়েছে সকলের, যে জাপানীরা জীবিত মানুষের থেকে মৃত মানুষের প্রতি অনেক বেশী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন তাঁদের ঐতিহ্য অনুযায়ী, এক্ষেত্রে তাঁরা কোনও স্মরণ সভা করলেন না, চুপচাপ থাকলেন, যেন চন্দ্র বোসের মৃত্যুটা তাঁদের কাছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই নয়, তাই শেষ শ্রদ্ধাটুকুও তাঁরা জানাবার প্রয়োজনই মনে করলেন না। বহু মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। শব দাহ যেখানে এবং যখন হয়, হবিবুর রহমান সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে কেউই বলতে পারে নি যে, সে শব দাহের সময় সামনেই ছিল। কিছু ভষ্ম রাশি শব দাহের প্রমাণ নয়, বিশেষ কারও মৃত্যুর প্রমাণ তো নয়ই।

সারা পৃথিবীব্যাপী ভারতীয় জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দেশের ভিতরে আমজনতা নেতাজীর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের দাবী তুলতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত নিরুপায় হয়ে ১৯৫৫ সালের তেসরা ডিসেম্বর নেহরু লোকসভায় ঘোষনা করলেন যে এই বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হবে। যার ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৫৬ সালের পাঁচই এপ্রিল ভারত সরকারের Notification No. F-30(2b) FEA\55 অনুযায়ী তিন সদস্য বিশিষ্ট অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। পরিবহণ ও রেল মন্ত্রকের সংসদীয় সচিব শাহ নওয়াজ খানের নেতৃত্বে এই কমিটি অনুসন্ধান শুরু করে। শাহ নওয়াজ খান নেতাজীর I.N.A.-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। অপর দুই কমিটি মেম্বার ছিলেন নেতাজীর অগ্রজ সুরেশ চন্দ্র বোস ও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মুখ্য কমিশনার এস. এন. মৈত্র। ঐ কমিটির সংখ্যা গরিষ্ঠের মত ছিল

যে বিমান দুর্ঘটনাতেই, ঐ তারিখে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সুরেশ চন্দ্র বোস এই রায় মেনে নিতে পারেন নি। তিনি তাঁর আপত্তির কারণ জানিয়ে পৃথক ভাবে একটি Dissentient Report পেশ করেন। সরকার সুরেশ চন্দ্র বোসের বক্তব্য মেনে নেয় নি, বাকী দুজনের রায়ই গ্রহণ করে, যেখানে বলা হয়েছিল যে নেতাজি ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনাতেই নিহত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঐ তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার কিছু দিন পরেই (১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫) বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের তরফে Finney Committee একটি অনুসন্ধান চালায়, কিন্তু ঐ কমিটি তাইহোকু বিমান বন্দরের কোনও রেকর্ড পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি।

ঘটনা যেখানে ঘটেছে বলে বলা হয়েছে, সেই অকুস্থলের কোনও রেকর্ড পরীক্ষা না করেই শাহ নওয়াজ কমিটি রায় দিয়েছিল। সেই রায় ভারত সরকার নির্দ্বিধায় মেনে নেয়। কিন্তু দেশবাসী সুরেশ চন্দ্রের বক্তব্যই গ্রহণ করেছিল। কারণ, তাঁর যুক্তিগুলো ছিল তথ্য ভিত্তিক এবং ধারালো।

নেহরু জমানা শেষ হবার পর যখন ইন্দিরা জমানা শুরু হল, তখন জন মতের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার আবার নতুন করে তদন্ত শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের ১১ ই জুলাই Notification no. 25|14|70|pol|I| অনুযায়ী পাঞ্জাব ও হারিয়ানার হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জি. ডি. খোসলাকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়। তাঁর তদন্তের বিষয় ছিল—

'to enquire into the facts and circumstances relating to the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose in 1945 and the subsequent developments connected therewith'.

এই খোসলা কমিশনের রায়ও পূর্বতন শাহ নওয়াজকে কমিটির রায়টিকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই রায় সানন্দে গ্রহণ করে। দেশের মানুষ কিন্তু প্রতিবাদ জানায়, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীতে সোচ্চার হয়।

১৯৭৭ সালের তেসরা আগষ্ট অধ্যাপক সমর গুহ পার্লামেন্টে খোসলা কমিশনের রিপোর্টের উপর একজন সাংসদ হিসাবে আলোচনার দাবী তোলেন। এই রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ হয়েছিল ১৯৭৪ সালের তেসরা সেপ্টেম্বর। ১৯৭৮ সালে প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই সমর গুহকে তাঁর প্রশ্ন সমূহের জবাব দেন, তারিখ ২৮শে আগষ্ট। তিনি তাঁর বিবৃতিতে বলেন:—

There have been two inquiries into the report of the death of Netaji Subhas Chandra Bose in the air-crash on 18th August, 1945 at Taihoku

airfield during his air-journey to Manchuria, one by a committee presided over by Major General Shah Nawaz Khan and the second by a one-man committee (sic) of enquiry headed by Sri G.D. Khosla, retired judge of the Punjab High Court. The majority report of the first committee and Sri Khosla held the report of the death as true. Since then, reasonable doubts have been cast on the correctness of the conclusions reached in the two reports and various important contradictions in the testimony of witnesses have been noticed, some further contemporary official documentary records have also become available. In the light of those doubts and contradictions and those records, Government find it difficult to accept that the earlier conclusions are decisive'.

এর পর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। প্রধান মন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তির পরেও সরকারী তরফে আরও অনুসন্ধানের কোনও উদ্যোগ দেখা যায় নি। এর পর কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট রুদ্রজ্যোতি ভট্যাচার্য্যের উদ্যোগে ১৯৯৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ঐ হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে আদেশ দেয় যে, নেতাজীর অন্তর্ধান নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তার অবসান হোক এবং এই রহস্য উন্মোচনে ভারত সরকারকে 'roving enquiry' অর্থাৎ ব্যাপক অনুসন্ধান চালাতে হবে। ১৯৯৮ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এ ব্যাপারে সব তথ্য ভারত সরকার জানাক এবং আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠিত হোক। Commission of Inquiries Act 1952, Clause 3 (1) অনুযায়ী লোকসভা বা কোনও বিধান সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার তদন্ত কমিশন তৈরী করতে পারে। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ভারত সরকার ১৯৯৯ সালে Notification No. S. O. 339 (E) মারফৎ সুপ্রীম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি মনোজ মুখার্জীকে এই তদন্তের দায়িত্ব অর্পণ করে। জনগণের লাগাতার দাবীকে সরকার উপেক্ষা করতে পারে নি, তার উপর রাজ্য সরকার ও হাইকোর্টের নির্দেশ তাদের পক্ষে অমান্য করা সম্ভব ছিল না।

মুখার্জী কমিশন ১৩১ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, এর মধ্যে মাত্র সাত জন বলে যে তারা বিশ্বাস করে যে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর খবরটি সর্বাংশে সত্য। এই সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন, নেতাজীর কয়েকজন সহকর্মী, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী এবং ডাক্তার ইয়োশিমি, যিনি অগ্নিদগ্ধ নেতাজীর চিকিৎসা করেছিলেন বলে দাবী করেন এবং ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। মুখার্জী কমিশন পূর্বতন দুটি তদন্তের সাক্ষ্য প্রমানও পরীক্ষা করে দেখে। তার ওপর দেখা হয় কিছু রেকর্ড, যে গুলি Exhibit হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, সংখ্যায় ৩০০ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র।

২০০০ সালের ২৩শে মার্চ কমিশন ফাইল নং 12(226)\56 PM (Investigation into the circumstances leading to the death of Subhas Chandra Bose) চেয়ে পাঠায়। প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে দোসরা মে জানানো হয় যে, ফাইলটি দেওয়া যাবে না কারন, সেটি নাকি 'destroy' করা হয়ে গেছে। হোম ডিপার্টমেন্ট ২২ শে জুন হলফনামায় জানায় যে –

"There are reportedly no files\ papers concerning Netaji\ I N A in their (under mentioned department) possession :-

1) Cabinet Secretariat

2) Intelligence Bureau

3) Research and Analysis Wing (RAW)

মজার ব্যাপার হল, দেখা গেল হোম ডিপার্টমেন্টের হলফনামাও ঠিক নয় কারণ, P.M.O. থেকে তার আগেই জানানো হয়েছিল যে উপরোক্ত ফাইলটি ১৯৭২ সালে নষ্ট (destroy) করে ফেলা হয়েছে নিয়মানুযায়ী, পুরাণো রেকর্ডের ক্ষেত্রে যা করা হয়ে থাকে। ক্যাবিনেট কার্য্যবিলী ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটেই পাকাপাকি ভাবে রাখা হয়। সুতরাং সেখান থেকেই ঐ সব রেকর্ড পাওয়া যেতে পারে।

১৯৭৮ সালে দেশাই লোকসভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা কিন্তু হাওয়ার ওপর ভিত্তি করে লেখা হয় নি। কিছু 'further contemporary official documentary records' পাওয়া গিয়েছিল, অবশ্যই যার ভিত্তিতেই পূর্বতন দুটি তদন্তের রায়কে গ্রহণ যোগ্য বলা যায়নি। মুখার্জী কমিশনের কাছে প্রধান মন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি ফাইলের জেরক্স কপি এসেছিল (No. 2/64/78-PM)Pol Section) যার থেকে কিছু তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। ঐ সব তথ্যের ভিত্তিতেই দেশাই বিবৃতিটি দেন। ২০০১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর পি.এম. এর তরফে হলফনামা দেওয়া হয় যে, গভীর অনুসন্ধানের পরেও 'comtemporary official documentary records' খুঁজে পাওয়া যায় নি। কমিশন পূর্বোক্ত ফাইলটি পাবার পর কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানায় যে ঐ, 'comtemporary records' যার কথা দেশাই তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন, তা যেন পাঠানো হয়। জবাবে সরকারের তরফ থেকে জানানো হয় যে, কয়েকজন বেসরকারী ব্যক্তি বিশেষের চিঠি, যা তাঁরা লিখেছেন কতগুলি পুরনো সংবাদপত্র সম্বন্ধে এবং তার উপরে দেওয়া নোটগুলিকে কোনও ভাবেই 'comtemporary official documentary records' বলা যাবে না। মুখার্জী কমিশন আপ্রান চেষ্টা চালিয়েছিল ঐ রেকর্ডগুলি

যাতে পাওয়া যায়। P.M.O. (Prime Minister's Office), Ministry of External Affairs, Cabinet Secretariat, Ministry of Home Affairs কেউ এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চায় নি, সকলেই একবাক্যে জানিয়েছে 'আমাদের কাছে কিছু নেই, আমরা কিছু জানি না'। তাহলে কি ধ'রে নিতে হবে দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে অর্থহীন প্রলাপ বকেছিলেন?

নেতাজীর অর্ন্তধান সম্পর্কিত তদন্তের ব্যাপারে ডঃ রাধাবিনোদ পালের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। যখন সরকারী তরফে কোনও তদন্ত এই ব্যাপারে শুরু হয় নি, এমন কি শুরু করার কথাও হয় নি, সেই সময়কার কথা। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং টোকিওতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য তৈরী করা ইন্টারন্যাশনাল কোর্টের অন্যতম বিচারক ড: পাল দ্বিতীয় যুদ্ধ শেষে জাপানে যান। সে দেশে থাকা কালীন তিনি সরকারী ও বেসরকারী কিছু তথ্যাবলী পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিলেন কারণ, নেতাজী তখন মিত্র শক্তির বিচারে একজন যুদ্ধাপরাধী বা war criminal এবং ডঃ পাল তাদেরই বিচারের ব্যাপারে তখন জাপানে গেছেন। ঐ কাজের সূত্রেই নেতাজী সংক্রান্ত বেশ কিছু খবর তিনি পেয়ে যান, যার দ্বারা তিনি ঐ বিমান দূর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর অসত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। ১৯৫৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি সর্বসমক্ষে বলেছিলেন—

'আমি ফরমোসায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনীকে সত্য বলে স্বীকার করতে পারি নাই। সে যাই হোক, আমি মনে করি সমস্ত বিষয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবী রাখে। কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির এখানে ওখানে প্রদত্ত বিবৃতির দ্বারা আমার সন্দেহের নিরসন হবে না। আমার অবিশ্বাসের পিছনে সঙ্গত কারণ আছে।'

১৯৫৫ সালের ৬ই অকটোবর এইচ.ভি. কামাথ একটি তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ভারত সরকারের মনোভাব জানতে চেয়েছিলেন। ডঃ পালও কলকাতায় ফেরার পর কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি অনুসন্ধান আরম্ভ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যদিও কামাথের প্রশ্নের উত্তরে নেহরু বলেন যে, ঐ ব্যাপারে যথার্থ তদন্ত করতে পারে একমাত্র জাপান সরকার, ঘটনার স্থান জাপান। তাই ভারত সরকার এ ব্যাপারে কিছু করতে অপারগ। যদি জাপান অনুসন্ধান করতে চায়, তাহলে ভারত সরকার অবশ্যই সহযোগিতা ও সাহায্য করবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, ভারত সরকারের পক্ষে জাপানে গিয়ে তদন্ত করার প্রশ্ন ওঠে না, যেহেতু সম্ভাব্য সকল সাক্ষীই জাপান সরকারের

অফিসার অথবা ঐ সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত। এর পর ডঃ রাধা বিনোদ পালের ব্যক্তিগত উদ্যোগ শুরু হবার অব্যবহিত পরেই ১৯৫৬ সালে নেহরু সরকার শাহনওয়াজ কমিটি তৈরী করেন। এই কমিটির সদস্যরা কী রায় দিয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। সদস্যরা জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনুসন্ধানের কাজে গিয়েছিলেন, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে, তাঁরা প্রচারিত প্লেন ক্র্যাশের জায়গাটা বাদ দিলেন অর্থাৎ ফরমোসার (বর্তমানে তাইওয়ান) তাইহোকুতে গেলেন না।

* * * *

লোকসভার প্রাক্তন সদস্য ডঃ সত্য নারায়ণ সিনহা ১৯৬৫ সালের জুন মাসে কলকাতায় একটি জনসমাবেশে বলেছিলেন যে, নেতাজী তাইহোকুর প্লেন ক্র্যাশে মারা যাননি। তিনি সাইবেরিয়ার একটি জেলের ৪৫ নং সেলে আটক আছেন। তিনি রাশিয়ায় ঢুকে ছিলেন সাইগন ছেড়ে যাবার পর, রাশিয়াতেই তাঁকে বন্দী করা হয়, তদানীন্তন সোভিয়েট সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে অন্য একটি নামে জেলে পোরা হয়। ডঃ সিনহা একথাও বলেন যে, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী অবনী মুখার্জী স্ট্যালিনের কাছে সুভাষ চন্দ্রের মুক্তির জন্য আবেদন করার ফলে কালো তালিকা ভুক্ত হন এবং পরে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয় (অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৯। ৬। ১৯৬৫)। এটা ঠিক যে বাঙ্গালী বিপ্লবী অবনী মুখার্জীকে গুলি করে মারা হয়েছিল এবং ঘটনাটি ঘটেছিল সোভিয়েট রাশিয়াতেই, তবে উপরোক্ত কারণে কিনা সেটা প্রমান সাপেক্ষ। স্ট্যালিন সুভাষ বিদ্বেষী ছিলেন বলে জানা যায় না, বরঞ্চ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে পাঠানো তিনজন গবেষক সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য আহরণ করেছিলেন, তাতে দেখা গেছে যে স্ট্যালিন জহরলাল নেহরুকে একজন 'রাজনৈতিক দেহ ব্যবসায়ী (A Political Prostitute) হিসেবে বর্ণনা করেছেন, (হিন্দুস্তান টাইমস ২৯। ১০। ২০০০)। এর সঙ্গে আরও অনেক অজানা তথ্য তাঁরা পেয়েছিলেন রাশিয়ান মিলিটারী আর্কাইভ থেকে যা কিনা ভারতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের অন্ধকার দিক গুলিকে উন্মোচিত করে। ঐ সব তথ্য জানাজানি হলে মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তাই বাম দল গুলির চাপে এশিয়াটিক সোসাইটি ঐ ইন্দো-রাশিয়ান প্রজেক্টটি মাঝ পথেই বন্ধ করে দেয় এবং তিন গবেষককে বাইরের দরজা দেখিয়ে দেয়। ভয় ছিল পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে।

মুখার্জী কমিশনের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। কমিশন ডাঃ তানেয়োশি ইয়োশিমির সঙ্গে দেখা করা এবং রেনকোজি মন্দিরে রাখা তথা কথিত নেতাজীর

চিতা ভষ্ম দেখা, এই দুটি কাজ নিয়ে টোকিও গিয়েছিল। ঐ মন্দিরে গিয়ে কমিশন প্রধান পুরোহিতকে ভষ্মাধারটি খুলে দেখাতে বলে। ভষ্মাধারটি একটি কাঁচের চেম্বারে রাখা ছিল। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ঐ ভষ্ম রাশির মধ্যে কোনও হাড় গোড়ের অবশিষ্টাংশ যদি পাওয়া যায়, তা নিয়ে ডি.এন.এ. পরীক্ষা করে দেখা। কিন্তু প্রধান পুরোহিত মুখার্জীকে জানালেন যে ঐ কাঁচের চেম্বারটি একজন দক্ষ মেকানিক ব্যতীত খোলা সম্ভব নয়। আর যেহেতু সেই দিনটি ছিল একটি ছুটির দিন (১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০২) কোনও মেকানিকের সার্ভিস সেদিন পাওয়া যাবে না। কমিশনের পক্ষে টোকিওতে থাকার সময় সীমা বাড়ানো সম্ভব ছিল না, তাই টোকিওতে ভারতীয় রাষ্ট্র দূতের কাছে কমিশন অনুরোধ জানাল যে একজন প্রতিনিধি রেনকোজি মন্দিরে পাঠিয়ে ঐ ভষ্ম রাশি পরীক্ষা করে যেন জানানো হয় যে সেখানে কোনও হাড়গোড় আছে কিনা।

ভারতীয় রাষ্ট্র দূত দুজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন ঐ মন্দিরে, যাদের নাম ছিল সি. রাজশেখর ও টি আর্মস্ট্রং চ্যাংসান, যথাক্রমে ফার্স্ট সেক্রেটারী ও সেকেন্ড সেক্রেটারী। ঐ দুই অফিসার প্রধান পুরোহিত ও তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতিতে ভষ্ম পরীক্ষা করেন ও ছবি তুলে একটি যুগ্ম রিপোর্ট কমিশনের কাছে পাঠান। রিপোর্ট পাবার পর কমিশন Centre for Cellular and Molecular Biology-র ডাইরেক্টর এবং Centre for DNA, Finger Prints and Diagnostics সংস্থার ডাইরেক্টরের কাছে ঐ রিপোর্ট এবং ছবি পাঠান ও জানতে চান যে ভষ্মের মধ্যে থাকা হাড়ের ডি.এন.এ. করা সম্ভব কিনা। উত্তরে CCMB-র ডাইরেক্টর জানান যে, যদি ঐ হাড়গুলি পোড়া ছাই থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তাহলে ঐ হাড় থেকে ডি.এন.এ. আলাদা করা যাবে না, কারণ ডি.এন.এ. পুরোপুরি পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবার কথা। যদি ঐ হাড় সমূহ না পুড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ডি.এন.এ. সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে, যদিও তা খুবই খারাপ অবস্থায় থাকবে। CCMB এ কথাও জানায় যে, এই পরীক্ষা করার জন্য যে বিশেষ গবেষণাগার প্রয়োজন, তা ভারতে নেই, সুতরা এ দেশে বসে ঐ পরীক্ষা করা যাবে না।

এর পর কমিশন জাপানে অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্র দূতের কাছে অনুরোধ জানান যেন ভষ্মাধারের হাড় গুলি আবার দেখা হয়, সম্ভব হলে একজন একসপার্টকে সঙ্গে নিয়ে, সেগুলি পুড়ে যাওয়া হাড়ের অবশিষ্টাংশ না না-পোড়া হাড়ের, ছবিতে যেহেতু এই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। কমিশন নিজেও বিভিন্ন দেশে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে, CCMB- র কাছেও জানতে চায় কোথায় এই পরীক্ষা করানো যায়। তাদের দেওয়া খবর অনুযায়ী জার্মানীর Max Planck

Institute for Evolutionary Anthropology- র Genetics Department- এর ডাইরেক্টর Dr. Svante Paabo কে চিঠি দেওয়া হয়, উত্তরে তিনি এ ব্যাপারে তাঁদের সংস্থার অক্ষমতার কথা জানিয়ে ইংল্যান্ডের University of Leicester-এর Genetics Department এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন। Commission এর চিঠির জবাবে তারাও জানায় যে প্রচন্ড তাপে পুড়ে যাওয়া ছাইয়ের মধ্যে পাওয়া হাড়ের অবশিষ্টাংশ থেকে DNA পাওয়া সম্ভব কিনা, তারা এ বিষয়ে সন্দিহান। কমিশনকে তারা বার্মিংহামের U.K.Forensic Service এর সাথে যোগাযোগ করতে বলে। মজার ব্যাপার হল তারা ভারতের CCMB- এর সাথেও যোগাযোগ করতে উপদেশ দেয়।

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন Ministry of External Affairs কে লেখে যে, ইংল্যান্ডের National Forensic Service Laboratories গুলির নাম ঠিকানা কমিশনকে জানানো হোক তদন্তের স্বার্থে। কোনও উত্তর আসে নি।

২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্য্যন্ত কমিশন বিভিন্ন জায়গায় চিঠির পর চিঠি, ফ্যাক্সের পর ফ্যাক্স করে গেছে, সদর্থক কিছু মেলেনি। ৯ই নভেম্বর ২০০৪ সালে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারকে জানায় যে রেনকোজি মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে সরকার কমিশনকে জানাক যে রেনকোজি মন্দির কর্তৃপক্ষ কমিশনের পাঠানো একজন একসপার্টকে ঐ ভষ্ম রাশি থেকে কম পোড়া হাড়ের টুকরো বেছে নিতে দেবে কিনা। উদ্দেশ্য একটাই, DNA পরীক্ষা ক'রে দেখা। প্রায় ছ'মাস বাদে ২০০৫এর দোসরা মে তারিখে কমিশন MEA (পররাষ্ট্র দপ্তর)থেকে উত্তর পায়, সঙ্গে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের বক্তব্য জাপানী ভাষায় লেখা এবং সঙ্গে তার ইংরেজী অনুবাদ। প্রধান পুরোহিতের উত্তরটি কমিশনের ঐ প্রস্তাবকে অনুমোদন করে নি। তাঁদের অনুমতি ব্যতীত কাজটা করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই মুখার্জী আবারও বিদেশ দপ্তরকে অনুরোধ জানান মন্দির কর্তৃপক্ষকে রাজী করাতে, আর কালক্ষেপ করা উচিত হবে না, এ কথাও জানান। চিঠির কপি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককেও পাঠানো হয় যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দুটি মন্ত্রকের কেউই ঐ আবেদনে সাড়া দেননি। মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট লেখার সময় পর্য্যন্ত কোনও উত্তর আসে নি।

মুখার্জী কমিশন শেষ পর্য্যন্ত ঐ ভষ্ম রাশির কোনও প্রকার DNA test করতে পারে নি। প্রতি পদে পদে কমিশনকে তদন্তের কাজে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কমিশন ইংল্যান্ডেও গেছে, House of Lords এর সদস্য Lord Peter Archer- এর সঙ্গে দেখা করে একটি বিশেষ ফাইল দেখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অনুমতি পায় নি।

কমিশন তাইওয়ানে গেছে, যেখানে নেতাজীকে দাহ করা হয়েছে বলে প্রচারিত, সেখানকার Crematorium Permit আর দাহ কার্য্যের রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখেছে। ডা: ইয়োশিমি 'চন্দ্র বোস' নামে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, অথচ শব দাহের রেজিষ্টারে দেখা গেল যে 'চন্দ্র বোস' নামে কোনও মৃত ব্যক্তির শব দাহ করা হয় নি, ঐ নামটি রেকর্ডে অনুপস্থিত। কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে তাইওয়ান সরকার এবং তাইপে সিটি গভর্ণমেন্ট স্বীকার করেছে যে, ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা হিন্দুস্তান টাইমসের অন-লাইন সংস্করণের রিপোর্টার অনুজ ধরের প্রশ্নের জবাবে তারা জানিয়েছিল যে, তাদের কাছে কোনও প্রমান নেই, যার দ্বারা ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট ওখানে বিমান দূর্ঘটনা হয়েছিল, এমন কথা কেউ বলতে পারে। আসলে গল্পটি যারা রটিয়েছিল, তাদের হোম ওয়ার্কে যথেষ্ট ঘাটতি থেকে গিয়েছিল।

মুখার্জী কমিশনে ভারত সরকারের তরফের সিনিয়র উকিল তারকেশ্বর পাল স্বীকার করেছেন যে ঐ বিমান দূর্ঘটনা সম্বন্ধে যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমান এ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে, তাতে যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়ে গেছে, এমন কি মৃত্যুর তারিখ, সময়, খবর প্রচার, ডেথ সার্টিফিকেট এবং শব দাহ, এই ব্যাপার গুলি সম্বন্ধেও যে সব কথা বিভিন্ন জনে বলেছে, কারও সাথে কারও বক্তব্য মেলে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এবার নেতাজীর চিকিৎসা, মৃত্যু এবং শেষকৃত্য সম্বন্ধে ডাঃ ইয়োশিমির বক্তব্য শোনা যাক। তিনি ঐ সময় তাইহোকুর নানমোন মিলিটারী হসপিটালে চিফ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ঐ হসপিটালে দূর্ঘটনায় আহতদের (নেতাজী সহ) আনা হয়েছিল। ১৯৪৫এর ১৮ই আগষ্ট বেলা দুটো নাগাদ তিনি একটি টেলিফোন বার্ত্তা বিমানঘাঁটি থেকে পেয়েছিলেন। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, একটি বিমান দূর্ঘটনায় কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং তাঁদের ঐ হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে, চিকিৎসার জন্যে। তার পর তিনটি মোটর গাড়ী আহতদের নিয়ে উপস্থিত হয় এবং ডাক্তার বাবুকে বলা হয় যে, আহতদের একজন হলেন চন্দ্র বোস (জাপানীরা তাঁকে ঐ নামেই ডাকত)। তিনি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলেন যে চন্দ্র বোস সাংঘাতিক ভাবে পুড়ে গেছেন, থার্ড ডিগ্রী বার্ণের ফলে তাঁর বাঁচার আশা নেই বললেই চলে। যেহেতু বোস সব থেকে বেশী পুড়ে গিয়েছিলেন, সেহেতু তাঁর চিকিৎসা সব থেকে আগে শুরু হয়। ৭/৮ ঘন্টা তাঁর জ্ঞান ছিল, সাতটা, সাড়ে

সাতটা নাগাদ অবস্থার অবনতি হতে থাকে, রাত আটটার একটু পরে তিনি মারা যান। ডাঃ ইয়োশিমি ফরমোজার আর্মির সদর দপ্তরে খবর পাঠান, সেখান থেকে লোকজন আসে এবং কম্যান্ডার-ইন-চিফের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি ফরম্যালিন ইনজেকশন দেন শব দেহে, তা না হলে শব দেহে পচন ধরত। নেতাজীর মৃত্যুর রাত্রেই তিনি ডেথ সার্টিফিকেট তৈরী করেন এবং সই করেন, জাপানী ভাষায় মৃতের নাম লেখেন 'কাটা কানা' (Kata Kana) যার মানে হল 'চন্দ্র বোস'। সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ হিসেবে তিনি 'থার্ড ডিগ্রী বার্নস' লেখেন।

অপর দুই ডাক্তার ডাঃ সুরুতা ও ডাঃ ইশি জানান যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাঁরা নেতাজীকে বাঁচাতে পারেন নি। ডাঃ সুরুতা শাহনওয়াজ কমিটিকে, ডাঃ ইশি খোসলা কমিশনকে একথা জানান।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার হল যে নেতাজীর আঘাত সম্পর্কিত কোনও হসপিটাল রেকর্ড পাওয়া যায় নি। প্রত্যেক হসপিটাল তাদের পেশেন্ট মারা গেলে রেকর্ড রাখে। তাঁর অসুস্থতার কোনও হিস্ট্রী শীট বা বেড হেড টিকিট কেউ দেখাতে পারে নি। মৃত দেহের সৎকার হয়ে যাবার পর সেই মর্মেও সার্টিফিকেট থাকে, তাও পাওয়া যায় নি।

হাসপাতাল অথবা শ্মশান, কোনও স্থানেই নেতাজীর কোনও ফোটো নেই।

নেতাজী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্টের রাষ্ট্রপিতা (Head of State) ছিলেন এবং তাঁর আজাদ হিন্দ সরকার বিশ্বের নয়টি স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি পেয়েছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল জাপান। তা সত্ত্বেও কোনও সামরিক অভিবাদন যা সরকারের প্রধানদের মৃত্যুর পর জানানো হয়ে থাকে শেষ যাত্রার সময়, এ ক্ষেত্রে হয় নি।

নেতাজীর মৃত্যু এবং সৎকার, কোনও অফিসিয়াল রেকর্ডের দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। ঐ রেকর্ড ব্যতীত কোনও কমিটি বা কমিশনের পক্ষেই নিশ্চিত করে কোনও সিদ্ধান্তেউপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র কিছু প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া বর্ণনা থেকে এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'অবশ্যই ঘটেছে' বলা ঠিক নয়, আইনের দৃষ্টিতে তো নয়ই।

শাহনওয়াজ কমিটির আগেও বৃটিশ ও আমেরিকান ইনটেলিজেন্সের তরফ থেকে খবরটির সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা হয়। ঐ সব অনুসন্ধানের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে কয়েকজন প্রত্যক্ষ দর্শীর মৌখিক বিবরণ ছাড়া আর কোনও রেকর্ড যেমন তাইহোকু এয়ার পোর্টের রেকর্ড, আর্মি হসপিটাল, তাইপে মিউনিসিপ্যাল ব্যুরো অব হেল্‌থ অ্যান্ড হাইজিন এবং তাইপে সিটি ক্রেমাটোরিয়ামের রেকর্ড

কিছুই দেখা হয় নি। প্রত্যক্ষ দর্শীদের বিবরণের যথার্থতা যাচাই করার কোনও চেষ্টাই হয় নি।

এই সব কারণেই 'Indian Worker' এর সম্পাদক হারীণ শাহ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'Indian Worker' ছিল Indian National Trade Union Congress (I N T U C) এর জার্নাল। ১৯৪৬ সালের আগষ্টের শেষের দিকে তিনি তাইপে যান এবং অনুসন্ধান চালান। তাঁর প্রাপ্ত তথ্যাবলী সাজিয়ে তিনি 'Gallant End of Netaji' বলে একটি বই লেখেন এবং শাহনওয়াজ কমিটির সামনে বক্তব্যও রাখেন। কমিটিকে শাহ জানান যে তিনি তাইপের Municipal Bureau of Health and Hygiene-এর ডিরেক্টরের সাথে দেখা করেন তাঁর অফিসে গিয়ে। তাঁকে শাহ নেতাজীর মৃত্যু ও শব দাহ সংক্রান্ত নথিপত্র দেখাতে বলেন। ডিরেক্টর দুজন ফরমোজান ক্লার্ককে (যারা ঘটনার সময় কর্মরত ছিলেন) প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র দেখাতে বলেন। ঐ দুজন ক্লার্ক নিম্নোক্ত কাগজপত্র দাখিল করে:—

১) নেতাজীর মৃত্যুর উপরে ডাক্তারের রিপোর্ট।

২) পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট।

৩) ব্যুরো দ্বারা ইস্যু করা দাহ কার্য্যের অনুমতিপত্র।

এই সব কাগজপত্র জাপানী ভাষায় লেখা ছিল বলে, ইংরাজীতে অনুবাদ করানো হয়েছিল। ডাক্তারের রিপোর্টটি নিম্নরূপ:—

From the Army Hospital
To the Bureau of Health and Hygiene
Date of the Report : 21st August 1945

<u>Certification of the Death</u>

Name of the Person :	Okara Ichiro (Meaning big warehouses of food and Ichiro means eldest son)
Sex :	Male
Birth :	Born in the Meiti 22nd year April 9
Occupation :	He was Taiwan Military Govt Army's obedient officer
Reason of Death :	By sickness

Nature of Sickness :	Heart Failure
Time of Sickness :	17th August, 1945
Time of Death :	19th August, 4 P.M.
Place of Death :	Army Hospital
The writer's certificate; Dated 21st August	
The name of the Doctor and the seal	Chhuluta Toyoji Chentze Siskwan (Japanese University)

শাহ এরপর জানান যে পুলিশ রিপোর্টটি ডাক্তারের রিপোর্টকেই সমর্থন করেছে। শব দাহের অনুমতি পত্রটি যেটি শাহ তাঁর সাক্ষ্যে উপস্থাপিত করেন, সেটি উপরোক্ত ডাক্তারের রিপোর্টের সঙ্গে মিলে গেছে। শাহ ঐ দুই ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করেন কেন নেতাজীর মর দেহ সনাক্তকরণ ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে সার্টিফিকেটে ভুল তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে। তার উত্তরে ওঁরা বলেন যে, এ ব্যাপারে তাঁদের কোনও ধারণাই নেই, তবে যে জাপানী অফিসারটি মৃত দেহের সঙ্গে ছিলেন, যাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা যা করার করেছেন, তিনি তাঁদের বলে দিয়েছিলেন যে সরকারী কারণে এই মানুষটির বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি গোপন রাখতে হবে।

শাহ তাঁর বইতে এবং কমিটিতে বলেন যে যদিও ঐ সব কাগজপত্রে দেওয়া তথ্যাদি Ichura Okara অর্থাৎ Okara Ichro সম্বন্ধে বর্ণিত, ঐ সব ডকুমেন্ট আসলে নেতাজীরই মৃত্যু এবং শব দাহ সম্পর্কিত। তিনি আরও বলেন যে জাপানী সৈন্য বাহিনীর কর্ত্তাব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতাজীর মৃত্যুর ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল।

ডেথ সার্টিফিকেটে এবং অনুমতি পত্রে দেওয়া তথ্যাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দী মিলছে না।

মুখার্জী কমিশন Institute of Taiwanese History-তেও যায় তদন্তের স্বার্থে। দৈনিক সংবাদ পত্রগুলির মাইক্রোফিল্ম করা পেরুসাল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়, কোথাও কোনও প্লেন ক্র্যাশের খবর নেই, প্রচারিত তারিখে। যদি সত্যিই ঐ তারিখে ঐ জায়গায় প্লেন ক্র্যাশটা ঘটত, নেতাজী সহ বেশ কয়েকজন নিহত হতেন, যাঁদের মধ্যে বলা হয়েছে জাপানী আর্মির একজন জেনারেল র‍্যাঙ্কের অফিসার শিদেয়ীও ছিলেন, তাহলে স্থানীয় সংবাদপত্র গুলি সে খবর কি ছাপত না?

যেখানে ১৯৪৫এর ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্থানীয় সংবাদ পত্র Central Daily News এ নেতাজীর পরিবার সংক্রান্ত একটি গুরুত্বহীন খবর ছাপা হয়েছিল, সেখানে এমন একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ কোনও খবরের কাগজ প্রচার করল না, বিশ্বাস করা কঠিন।

মুখার্জী কমিশনের অনুরোধে তাইওয়ানের বিদেশ মন্ত্রক কিছু ডকুমেন্ট পাঠিয়েছিল। ঐ সব ডকুমেন্ট শব দাহের রেজিস্টারে যে সব এন্ট্রি হয়েছিল তাইপের পুরনো শ্মশানে, তারই কপি, বলা বাহুল্য ঐ সময়কার, অর্থাৎ ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫ থেকে ২৪শে আগষ্ট, ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত। কমিশন কালবিলম্ব না করে সন্দীপ শেঠ নামে একজন অনুবাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এর সন্ধান কলকাতাস্থিত জাপানী দূতাবাসই দিয়েছিল।

সন্দীপ শেঠ জাপানী ভাষা থেকে ঐ সব ডকুমেন্ট ইংরেজিতে অনুবাদ করে কমিশনকে রিপোর্ট করে। সেখানে দেখা যায় যে, তাইপের শ্মশানের রেজিস্টারে 'চন্দ্র বোস' বা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, পাইলট টাকিজাওয়া, কো-পাইলট আওয়াগী এবং জেনারেল শিদেয়ী, কারও নাম নেই। এঁরা ঐ তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন বলে দাবী করা হয়েছিল। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, শুধু নেতাজী নন, তাঁর সহযোগীদের মধ্যেও যাঁরা যাঁরা মারা গেছেন বলা হয়েছে, সবটাই সাজানো। এখানে ডাক্তার ইয়োশিমির ভূমিকা রীতিমত রহস্যজনক। কমিশন জাপানে গিয়ে ইয়োশিমির সঙ্গে দেখা করেছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে তিনি তোশিকাজু শিমোদা নামে কাউকে চেনেন কিনা, শিমোদার ঠিকানাও বলা হয়। এর উত্তরে ডাক্তারবাবু জানালেন যে এই নামে তিনি কাউকে চেনেন না।

শিমোদার পাঠানো 'চন্দ্র বোসের' একটি ডেথ সার্টিফিকেট, যেটা তিনি ডাঃ ইয়োশিমির কাছ থেকে পেয়েছিলেন ১৮ই আগষ্ট, ১৯৮৮ সালে, কমিশনে জমা পড়েছিল। সেই সূত্র ধরেই তাঁকে প্রশ্নটি করা হয়েছিল। ডেথ সার্টিফিকেটটি দেখে তিনি স্বীকার করেন যে, ওটি ফোটোকপি এবং সইটা তারই। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন পরিস্থিতিতে তিনি ঐ কপিটি দেন, তিনি জানান যে তাঁর সে কথা মনে নেই। ১৯৮৮ সালে তিনি একজনকে নেতাজীর একটা ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, খোসলা কমিটিকে বলছেন যে, হাসপাতাল থেকে বিদায় নেবার পর (২১শে জানুয়ারী, ১৯৪৬) হাসপাতালের রেকর্ডস কোথায় গেছে, কি হয়েছে তিনি জানেন না এবং ফরমোসার সরকারী তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্টে বলা হচ্ছে যে হাসপাতালের রেকর্ডস পাওয়া যায় নি, এই সব থেকে একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ঐ ডেথ সার্টিফিকেটটি জাল।

মুখার্জী কমিশনের কাজ চলাকালীন সংবাদ সংস্থা পি.টি.আই. দাবী করেছে যে, তারা বৃটিশ Public Records Office থেকে ডাঃ ইয়োশিমির একটি বিবৃতি আবিষ্কার করেছে, যার ফলে নেতাজীর মৃত্যু নিয়ে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না, তিনি ঐ বিমান দুর্ঘটনাতেই ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট মারা গেছেন। নেতাজী নিয়ে কোনও রিসার্চ ইতিপূর্বে পি.টি.আই .কোনদিন করেছিল কিনা আমরা জানি না। হাঠাৎ তারা এ ব্যাপারে অত্যুৎসাহী হয়ে উঠল কেন, তা বোঝা গেল না।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পনের পর ডাঃ ইয়োশিমি হংকঙে বৃটিশ গোয়েন্দাদের কাছে ঐ বিবৃতিটি দেন। ডাক্তারবাবু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কাছে নানা ধরনের বিবৃতি দেন। শরৎ বসুর দৌহিত্র আশিষ রায় ১৯৯৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর ডাক্তারবাবুকে ইন্টারভিউ করেছিলেন বলে দাবী করেন, তাও দিল্লীতে ব'সে, টেলিফোনে জাপানস্থিত ডা: ইয়োশিমির সঙ্গে কথা ব'লে। সেই ইন্টারভিউতে ইয়োশিমি তথাকথিত প্লেনক্র্যাশের কথা, যেটা নাকি ঐ ইন্টারভিউয়ের পঞ্চাশ বছর আগে ঘটে গেছে, গড় গড় করে বলে যান, যেন কালকের কথা।

ডাঃ ইয়োশিমি তাঁর প্রথম বিবৃতি দেন Allied Intelligence Service এর কাছে, তারিখ ১৯৪৬ সালের ১৯শে অক্টোবর।

দ্বিতীয় বিবৃতিটি তিনি দেন ১৯৫৬ সালের ২২শে ও ২৩শে মে, শাহ নওয়াজ কমিটির সামনে, ঘটনার এগারো বছর পরে।

তৃতীয় বিবৃতি— ১৯৭১ সালের ২৪শে এপ্রিল, খোসলা কমিশনের সামনে, প্রায় ছাব্বিশ বছর পরে।

চতুর্থটি সম্বন্ধে আগেই বলেছি, ১৯৯৫ সালে। এত গুলি বিবৃতি ঐ ডাক্তার বিভিন্ন সময়ে দিয়েছেন, সে গুলি আলোচিতও হয়ে গেছে অনেকবার। তার পরেও পি.টি.আই. আবার ঐ ডাক্তারের বিবৃতি নতুন করে প্রচার করার কাজে নেমে পড়ল কী কারণে, বোঝা দায়।

Allied Intelligence এর কাছে ডাঃ ইয়োশিমি বলেছিলেন ১৮ই আগষ্ট বিকেল পাঁচটায় নানমোন মিলিটারী হসপিটালে নেতাজীকে আনা হয়েছিল। আরও ছ-সাতজন আহত পেশেন্ট সঙ্গে ছিলেন। এঁদের যে তাঁর হসপিটালে পাঠানো হচ্ছে, সে খবর তাঁকে কেউ আগাম জানায় নি।

শাহ নওয়াজ কমিটিকে কি বললেন?

দুপুর দুটো নাগাদ তাইহোকু এয়ার ফিল্ড থেকে ফোনে তাঁকে জানানো

হয়েছিল যে প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে এবং পেশেন্ট পাঠানো হচ্ছে। এর ঠিক মিনিট কুড়ি পরেই তেরো চোদ্দজন আহত ব্যক্তির সঙ্গে নেতাজীকে আনা হয়।

খোসলা কমিশনকে কি বললেন?

দুপুরের আগেই এয়ার ফিল্ড থেকে ফোন পান, বেলা সাড়ে বারোটায় সাতজন হাসপাতালে আসেন যাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন ভারতীয়।

আশিষ রায়কে কি বললেন?

যতদূর মনে পড়ে দুপুর দুটো নাগাদ, একটাও হতে পারে, লাঞ্চের পরেই মিলিটারী এয়ার পোর্ট থেকে এমার্জেন্সী কল এসেছিল। চন্দ্র বোসকে ট্রাকে করে আরও কয়েকজন আহত ব্যক্তির সঙ্গে হাসপাতালে আনা হয়।

পি.টি.আই. যে খবরটি প্রচার করেছে সেখানে তিনি বলেছেন যে, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ইশি একজন আহত ভারতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে বলেছেন যে ইনি হলেন চন্দ্র বোস, এর চিকিৎসায় যেন কোনও ত্রুটি না হয়। কর্ণেল ইশির কথা ডাঃ ইয়োশিমির শাহনওয়াজ ও খোসলাকে দেওয়া বিবৃতিতে পাওয়া যায় না।

* * * *

সত্যরঞ্জন বকসী ছিলেন নেতাজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে সমমনোভাবাপন্ন একজন সহযোগী। খোসলা কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দান কালে তিনি বলেছিলেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময় তিনি দিল্লীতে ভুলাভাই দেশাইয়ের সাথে দেখা করেন। দেশাই বিচারাধীন বন্দীদের পক্ষের প্রধান অ্যাডভোকেট। দেশাই জানান বিচারের সময় এক মৃত ব্যক্তির ফোটো দেখানো হয়েছিল যার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ঢাকা ছিল, ঐ ব্যক্তিই নাকি নেতাজী। তাইহোকু এয়ার ফিল্ডের একটি ফোটোও দেখানো হয় যার পারিপার্শ্বিকের সাথে তাইহোকুর ভৌগোলিক চেহারার কোনও মিল নেই।

১৯৭০ সালের চৌঠা নভেম্বর খোসলা কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে নেতাজী-অগ্রজ সুরেশ চন্দ্র বোস বলেছিলেন যে, যুদ্ধ শেষ হবার অনেক আগেই নেতাজী প্ল্যান করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ হলে তিনি রাশিয়া চলে যাবেন। এ ব্যাপারে জাপানীরা তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধে মিত্র শক্তি জয় লাভ করলে তাদের দৃষ্টিতে 'যুদ্ধাপরাধী' নেতাজীকে তারা বন্দী করতে চেষ্টা করবে, জাপান সরকারকে তারা নেতাজীকে তাদের হাতে তুলে দিতে বলবে। তখন জাপান

তাদের বলবে যে, নেতাজী একটি বিমান দূর্ঘটনায় মারা গেছেন।—

"When the victorious Anglo Americans would call upon the Japanese Govt, to hand him over to them as a war-criminal, they would say that Netaji died in a plane-crash."

সুরেশ বোস শাহ্ নওয়াজ কমিটির সদস্য থাকাকালীন এই তথ্য গুলি পেয়েছিলেন। ডাঃ রাধা বিনোদ পালের কথা আগেই বলেছি। তিনি দেশে ফিরে জানান যে, জাপানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী তোজোর স্ত্রী তাঁকে বলেছেন, ভারতের জনগণ নেতাজীর প্লেন ক্র্যাশে মৃত্যুর গল্প যেন বিশ্বাস না করে।

১৯৪৬ সালে Allied Intelligence Service এর কাছে ডাঃ ইয়োশিমি যখন বক্তব্য পেশ করেন, তখন তাঁর বয়স খুব কম ছিল। স্মৃতি শক্তি তাজা থাকারই কথা, তার ওপর প্লেন ক্র্যাশের ঘটনাও তখন সদ্য ঘটেছে। কিন্তু ঐ সময় তিনি নিশ্চয় করে বলতে পারেন নি কে বা কারা নেতাজীকে সনাক্তকরণ করেছিল। আহত ভারতীয় মানুষটি যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস, সেটা উনি জানলেন কি ভাবে? ডাঃ ইয়োশিমি বলেছিলেন— যে সনাক্ত করেছিল তার নাম সম্ভবতঃ ইশি। শাহ্ নওয়াজ ও খোসলার সামনে ইশির নাম তিনি বলেন নি। আবার দেখুন ১৯৯৫ সালে আশিষ রায়কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে, হাসপাতালে আনা আগুনে পোড়া মানুষটিকে লেফটেন্যান্ট নোনোমিয়া 'চন্দ্র বোস' বলে সনাক্ত করেন। ১৯৯৫ সালে তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, অথচ স্মৃতি শক্তি কত জোরালো, তখন ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরেও নোনোমিয়ার নামটি তিনি ভোলেন নি, অথচ তার আগে ১৯৪৬, ১৯৫৬ এবং ১৯৭১ সালে নোনোমিয়া অদৃশ্য, ১৯৯৫ সালে তিনি ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হলেন, ডাঃ ইয়োশিমির স্মরণপটে। আরো আছে, ১৯৪৬ সালে Allied Intelligence এর কাছে বলেছিলেন যে, চন্দ্র বোসের শরীর সাঙ্ঘাতিক ভাবে পুড়ে গিয়েছিল, বিশেষতঃ মাথা, বুক ও উরু, কিন্তু দশ বছর বাদে যখন শাহ্ নওয়াজ কমিটি তাঁকে নেতাজীর একটি বহুল প্রচারিত ছবি দেখায়, দেখা মাত্র তিনি বলেন যে হ্যাঁ, এই সেই লোক অর্থাৎ চন্দ্র বোস যাঁর তিনি চিকিৎসা করেছিলেন। অথচ ১৯৪৫ এর ১৮ই আগষ্টের আগে তিনি (তাঁর বয়ান অনুযায়ী) নেতাজীকে কখনও দেখেননি, নামও শোনেন নি, তাঁর কোনও ছবিও নিশ্চয়ই দেখেন নি।

পি.টি.আই. জানিয়েছে যে ডাঃ ইয়োশিমি নিজেই নেতাজীর শরীরের পুড়ে যাওয়া অংশ গুলি ড্রেস করে দেন, প্রথম চার ঘন্টা তিনি প্রায় অজ্ঞানের মতই ছিলেন এবং কিছু কথা বলছিলেন। ডাঃ ইয়োশিমি জাপানী ভাষায় কথা বলছিলেন,

আর নেতাজী ইংরাজিতে। সে কারণে একজন দোভাষীর সাহায্য চাওয়া হয়। তখন নাকামুরা নামে একজন দোভাষী আসে যে বলে সে চন্দ্র বোসের সঙ্গে দোভাষী হিসেবে ইতিপূর্বে কাজ করেছে। এটাও একটু অদ্ভুত, তাই না? একজন মৃতপ্রায় রোগীর জন্য দোভাষী চাওয়া হল, সাথে সাথে একজনকে পাওয়াও গেল, সে আবার নাকি রোগীর পূর্ব পরিচিত।

খোসলা কমিশনে ডাঃ ইয়োশিমি বলেছিলেন হাসপাতালে চন্দ্র বোস আহত অবস্থায় বারো ঘন্টা বেঁচে ছিলেন। হাসপাতালে বোসের চিকিৎসার জন্য ডাঃ ইয়োশিমি নাকি সারা ক্ষণই তাঁর কাছে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি খোসলা এবং শাহ নওয়াজ দু'জনের কাছে দু'রকম বিবৃতি দেন।

* * * *

সব কিছু খতিয়ে দেখে মুখার্জী কমিশন মনে করেছে যে, এ সব থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, হার্টফেল করে ১৯শে আগষ্ট ১৯৪৫ সালে ইচিরো ওকুরার মৃত্যু এবং ঐ বছরেরই ২২শে আগষ্ট তার শেষকৃত্য (এক দিন আগে পারমিট ইস্যু করা হয়) নেতাজীর মৃত্যু ও শেষ কৃত্য বলে চালানো হয়। জাপানীরা তাঁকে নিরাপদে অন্যত্র চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেবার জন্যই সম্ভবতঃ এই রটনাটি করেছিল। একটি ধোঁয়াশা তৈরী ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে হবিবুর রহমান, যিনি ঐ প্লেনে নেতাজীর সহযাত্রী ছিলেন এবং ঐ সামরিক হাসপাতালের ডাক্তার সুরুতা (Tsuruta), এই দু'জনের বক্তব্য শোনা যাক।

ডাঃ সুরুতা ঐ হাসপাতালে ঘটনার সময় কর্মরত ছিলেন। জাপান সরকারের তরফ থেকে যে অনুসন্ধান চালানো হয়, সেখানে ডাঃ সুরুতা ১৯৫৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কী বলেছিলেন দেখা যাক।

তিনি জানালেন যে তাঁর মনে আছে যে, ঐ মৃত্যুর বেশ কয়েক দিন পরে শবটি দাহ করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর দিন মোটেই দাহ কার্য্য হয় নি, মিঃ বোস মারা যাবার বেশ কয়েক দিন পরে আর্মি হেড কোয়ার্টাসের অনুরোধে তিনি একটি ডেথ সার্টিফিকেট তাঁর নিজের নামে ইস্যু করেন। পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে মরদেহ টোকিওতে পাঠানো যায় নি। তাইপেতে দাহ কার্য্য করার সিদ্ধান্ত হঠাৎই নেওয়া হয়। সে কারণে আর্মি হেড কোয়ার্টাস জানাচ্ছে যে, ডাঃ সুরুতা যেন একটি ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে দেন শেষ কৃত্য সমাপন করার জন্য। ডাঃ সুরুতাকে তাঁরা ঐ সার্টিফিকেটে মিঃ বোসের নাম লিখতে নিষেধ করে, তাঁর

পরিচয় যাতে ফাঁস না হয়ে যায়। সেই কারনে ডাঃ সুরুতা একটি ভুয়া নাম ব্যবহার করেছিলেন যেটা হল হাচিরো ওখুরা (Hachiro Okhura)।

উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি ঐ জাপানী নামটা ব্যবহার করে ছিলেন এ ক্ষেত্রে, কারণ, ইতিপূর্বে ইচিরো ওকুরার মৃত্যুর পর তিনি একটি নির্ভেজাল ডেথ সার্টিফিকেট ওকুরার নামে দিয়েছিলেন।

হবিবুর রহমান শাহ নওয়াজ কমিটির কাছে বলেন যে, ১৯৪৫এর ২০শে আগষ্ট অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়েছিল, অথচ ট্যান টিটি (Tan Titi) যিনি ঐ সময় ব্যুরোতে শব দাহের অনুমতি পত্র দেবার দায়িত্বে ছিলেন, বলেছেন যে দাহ হয়েছিল বাইশে আগষ্ট ১৯৪৫ সালে। শব দাহের যে ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে, সেখানে অবশ্য ২২শে আগষ্ট তারিখটি পাওয়া যাচ্ছে। হবিবুর রহমান কমিটিতে বলেন যে, মরদেহ যখন কফিনে দেওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেহটি পুরোপুরি পোশাকে ঢাকা ছিল। শরীরের কোনও অংশই দেখা যাচ্ছিল না।

চ্যাংচুয়েন, যিনি শ্মশানে সেই সময় উপস্থিত ছিলেন বলে দাবী করেছেন, খোসলা কমিশনে বলেন যে, যখন কফিনটি ট্রাক থেকে নামিয়ে আনা হল অন্ত্যেষ্টির পূর্বে, তখন শ্মশানের কীপার বলে যে কফিনটি অনেক বড় হওয়ার জন্য চুল্লীতে ঢুকবে না। সুতরাং কফিনটি খোলা হল, ভেতরটা ক্যালসিয়াম অক্সাইডে ভরা ছিল। মর দেহটি একটি কাপড়ে ও জাপানী মিলিটারী কম্বলে জড়ানো ছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি শবদেহের মুখ দেখতে পেয়েছিলেন কিনা, তার উত্তরে তিনি জানান যে মুখ পুরোপুরি ঢাকা ছিল। আরেক জন প্রত্যক্ষদর্শী (শব দাহের) যাঁর নাম মিঃ নাগাটোমো, প্রাক্তন মেজর, শাহ নওয়াজ কমিটিতে বলেন যে, পুরো কফিনটাই স্লাইডিং প্লেটে বসানো হয়েছিল। জাপানে এটাই নিয়ম যে শব দাহ করা হবে কফিন শুদ্ধু। 'ফারনেসে শব দেহ ঢোকাবার পর আমরা ফারনেসের পেছনে চলে যাই এবং আমিই আগুনটা ধরাই'। ('After placing the body in the furnace we went to the backside of the furnace and I set fire')।

যে ভাবেই শব দেহটি চুল্লীতে দেওয়া হোক না কেন, এটা পরিষ্কার যে মৃতকে যাতে সনাক্ত করণ না করা যায়, তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। হবিবুর রহমান কমিটির সামনে বলেন যে শব দেহের ফোটো (মুখ বাদ দিয়ে) তাঁর অনুরোধেই নেওয়া হয়ে ছিল। মুখের অবস্থা ভালো না থাকার কারণে, তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, মুখের ছবি যেন না তোলা হয়। 'Out of sheer sentiment' মুখের চেহারা যদি স্বাভাবিক থাকত, তাহলে হবিবুর মুখের ছবি তোলার ব্যাপারে আপত্তি জানাতেন না।

এখানে প্রশ্ন হলো যদি শব দেহটি ঢাকা দেওয়াই ছিল, তাহলে আবার মুখ বাদ দিয়ে ছবি তোলার কথা ওঠে কি ভাবে? এ থেকে একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যেহেতু ইচিরো ওকুরা হার্টফেল করে মারা গিয়েছিল, সেহেতু তার শরীরে কোনও ক্ষত চিহ্ন থাকার কথা নয়, মুখে তো নয়ই। সম্ভবতঃ সে কারণেই হবিবুর রহমান মুখ বাদ দিয়ে মৃতের ছবি নিতে ব'লেছিলেন, মুখ দেখলে তো সবাই বুঝে ফেলবে ইনি নেতাজী নন, অন্য কেউ।

জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধ রীতি অনুযায়ী মৃতের সৎকার মৃত্যুর তিন দিন বাদে করা হয়। ইচিরো ওকুরার মৃত্যু হয় উনিশে আগষ্ট, সৎকার হয় ২২শে আগষ্ট, রীতি অনুযায়ী ঠিকই আছে। সৎকারের পর শব দেহের প্রতিটি অংশের অস্থি তুলে নিয়ে ভষ্ম রাশির সাথে রেখে দেওয়া তাঁদের রীতি। এই তথ্য শাহ নওয়াজ কমিশনে দেওয়া মিঃ নাগাটোমোর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়। পুরো ব্যাপারটা এক দিকেই ইঙ্গিত করছে, যে মানুষটির মৃত দেহ দাহ করা হয়েছিল এবং যার নশ্বর দেহাবশেষ শ্মশানের চুল্লী থেকে সংগৃহীত হয়েছিল, তিনি নেতাজী নন, তাঁর নাম ইচিরো ওকুরা।

এ সব থেকে যে সত্যটা বেরিয়ে আসছে তা হল যে, ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট নেতাজী মিত্র শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে তাদের আওতার বাইরে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে জন্যই বিমান দুর্ঘটনা, নেতাজীর মৃত্যু, তাঁর মর দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ইত্যাদি কাহিনী জাপানের আর্মির কর্ত্তা ব্যক্তিরা রটিয়ে দেওয়া হবে বলে ঠিক করেছিলেন। ঐ কর্ত্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন ডাঃ ইয়োশিমি, ডাঃ সুরুতা এবং হবিবুর রহমান। সেই অনুযায়ী ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৫ ঐ কর্ত্তা ব্যক্তিদের নির্দেশ অনুযায়ী আই.এন.এ-এর এস এ আইয়ার একটি বিবৃতি তৈরী করেন, যার ভিত্তিতে ডোমাই নিউজ এজেন্সী খবর প্রচার করে। যাঁরা ঐ খবরটি তৈরী করেছিলেন, তাদের কাছে সত্য গোপন করা ছাড়া উপায় ছিল না। এই কাজটি করতে গিয়ে তাঁরা অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ এবং পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের জন্ম দেন নিজেদের সাক্ষ্যে এবং অনেক ফাঁক ফোঁকর থেকে যায়, যেগুলি মুখার্জি কমিশন আবিষ্কার করেছে, পর্যায় ক্রমে।

চিতা ভষ্মের জার্নির কথায় আসা যাক। হবিবুর রহমান তাইপের শ্মশান থেকে চিতা ভষ্ম সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ভষ্ম তাইওয়ান থেকে জাপান যাত্রা করে। এ ব্যাপারে কারও কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না। কারণ, সত্যিই চিতা ভষ্ম তাইপের শ্মশান থেকে জাপানে চলে যায়। প্রশ্ন তো অন্য জায়গায়, সেটা হল চিতা

ভষ্ম কার মর দেহের এবং কার ব'লে চালানো হয়েছিল। তাহলে রেনকোজি মন্দিরে যে চিতা ভষ্ম সযত্নে রক্ষিত আছে, তা ইচিরো ওকুরার, নেতাজীর নয়। ইচিরো ওকুরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোনও প্রকার সংগ্রাম করেছিলেন বলে জানা নেই, তবু আমরা দেখেছি স্বাধীন ভারতের শাসক বৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ আজও ঐ চিতা ভষ্ম ভারতে আনার পক্ষপাতী এবং জহরলাল নেহরু থেকে আরম্ভ করে অটল বিহারী বাজপেয়ী পর্য্যন্ত ভারতের তাবড় তাবড় রাষ্ট্র নেতারা জাপানে গিয়ে রেনকোজি মন্দিরে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন। শুধু কি তাই? বছরের পর বছর ঐ ভষ্ম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভারত সরকারের কোষাগার থেকে বিপুল পরিমান অর্থ জাপানে পাঠানো হয়ে আসছে, আমার আপনার ট্যাক্সের টাকা চলে যাচ্ছে ইচিরো ওকুরার স্মৃতি রক্ষার্থে প্রত্যেক বছর জাপানের রেণকোজি মন্দিরে, কে আটকাবে? শুধুমাত্র একটা মিথ্যেকে জিইয়ে রাখবার জন্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এবার আসুন দেশের কিছু সাধু সন্তের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

কুচবিহার জেলার ফালাকাটায় শৌলমারী আশ্রমের জন্ম হয় ১৯৫৯ সালে, আশ্রমটি স্থাপিত করেন সারদানন্দজী নামে এক সাধু। কুচবিহারের সঙ্গে, সকলেই জানেন, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের বর্ডার আছে। প্রথম দিকে স্থানীয় লোকজন ঐ আশ্রম বা ওখানকার সাধুর ব্যাপারে কোনও আগ্রহ বা কৌতূহল বোধ করে নি। কিন্তু যখন আশ্রমের পরিধি ১০০ একর ছাড়িয়ে গেল, ঐ আশ্রমের বাসিন্দাদের সংখ্যা দেড় হাজার হয়ে দাঁড়াল, সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন হল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ জনের দৃষ্টি ঐ দিকে আকৃষ্ট হল। কয়েক মাসের মধ্যে কুচবিহারে গুজব রটে গেল যে ঐ সাধুই হলেন ছদ্মবেশী নেতাজী। ১৯৬১ সালের মধ্যে সারা ভারতে গুজবটি ছড়িয়ে পড়ল।

মেজর সত্য গুপ্ত যিনি নেতাজীর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঐ সাধুর সঙ্গে দেখা করেন। কলকাতায় ফিরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করেন যে ঐ সাধুই নেতাজী। এর পর অনেক খ্যাত অখ্যাত ব্যক্তি আশ্রমটিতে গিয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করে,

তাদের মধ্যে কেউ বলেছে হ্যাঁ, কেউ বলেছে না। বিষয়টি পার্লামেন্টেও আলোচিত হয়েছে, বিতর্কিত হয়েছে। ঐ সাধু আশ্রমে ছ-সাত বছর কাটানোর পর দেরাদুনে চলে যান এবং ১৯৭৭ সালে সেখানেই মারা যান।

খোসলা কমিশনেও এই বিষয়টি এসেছিল, কোনও মীমাংসা হয় নি। মুখার্জী কমিশনে ১১ জন সাক্ষীর মধ্যে আটজন বলেন যে ঐ সাধুটি নেতাজী, বাকী তিনজন এ কথা মানতে অস্বীকার করেন। ঐ আটজন মাঝে মধ্যে আশ্রমে যেতেন ব'লে জানান। একজন ছাড়া অন্যরা কেউই কোনও ডকুমেন্ট দেখাতে পারেন নি, যার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে যে ঐ সাধুই নেতাজী। একজন একটি চিঠি দেখিয়েছিলেন যেটা ১৯৬৭ সালে ঐ সাধু নাকি তাঁকে আশ্রমের জন্য ডোনেশন যোগাড় করার নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন। হস্তলিপি বিশারদদের দিয়ে কমিশন ঐ চিঠি পরীক্ষা করিয়ে দেখে যে নেতাজীর হাতের লেখার সাথে কোনও মিল নেই।

জলপাইগুড়ি কোর্টের একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট যিনি আবার জলপাইগুড়ি ল কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং ঐ আশ্রমের স্টোরের দেখাশুনা করতেন, জানিয়েছিলেন যে, ঐ সাধুটি নিজেকে নেতাজী বলে দাবী করেন নি কখনও। তিনি একজন ব্রাহ্মণ সন্তান এবং পূর্ব বঙ্গের লোক, এ কথা সারদানন্দজী নিজেই আশ্রমের ভিতরে এবং বাইরের বিভিন্ন সভায় বলেছেন।

খোসলা কমিশনের সামনে নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার জানান যে ঐ সাধুর সঙ্গে নেতাজীর চেহারার কোনও মিল ছিল না, তাঁর কথায় পূর্ব বঙ্গের সিলেটের টান ছিল এবং কথা বলার ধরনটাও নেতাজীর মত ছিল না। এক্ষেত্রে মুখার্জী কমিশন ঐ সাধুই যে নেতাজী এই ধারণা বা সিদ্ধান্তের সপক্ষে কোনও প্রামাণ্য তথ্য পায় নি।

এবার চলুন শিউপুরকালান জেলায়। মুখার্জী কমিশনের সামনে জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত নামে মধ্য প্রদেশের শিউপুরকালান জেলার এক বাসিন্দা দাবী করেছিলেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলা কালীন একটি প্লেন কাছের একটি গ্রামে ক্র্যাশল্যান্ড করে। তিনজন যাত্রী বেঁচে যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন সাধু, কর্ণেল হবিবুর রহমান ও হিটলার। গুপ্তর মতে ঐ সাধুই নেতাজী যিনি তাঁদের গ্রামে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭৭ সালে একুশে মে তিনি মারা যান। কমিশন গুপ্ত এবং আরও চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে, যদিও ঐ সাধু শিউপুরকালানেই মারা যান, ঐ তারিখেই (২১। ৫। ১৯৭৭), কিন্তু তিনিই যে নেতাজী, তার কোনও প্রমাণ এরা দিতে পারে নি। এরা আগে কোন দিন নেতাজীকে চাক্ষুষ দেখেনি। প্লেনের

ক্র্যাশল্যান্ডের গল্পটা এতই হাস্যকর যে তা নিয়ে আলোচনা করাই বৃথা।

এবার আসা যাক ফৈজাবাদে, সাধু থিওরী গুলির মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা রোমহর্ষক। কমিশনে কয়েকজন জানান যে ১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নেতাজী সোভিয়েট রাশিয়া থেকে পালিয়ে ভারতে আসেন, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করার পর ফৈজাবাদে আসেন। ১৯৮৫ সালে 'রাম ভবন' অর্থাৎ যেখানে তিনি ছিলেন, সে স্থান ত্যাগ করে কোনও অজানা গন্তব্যের অভিমুখে যাত্রা করেন। রেখে যান তাঁর ব্যবহার করা প্রচুর জিনিসপত্র যার মধ্যে ছিল কিছু পারিবারিক ছবি, বই, চিঠি পত্র এবং জামাকাপড়। কমিশন ফৈজাবাদে গিয়ে জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করে এবং ২৬০০ জিনিসপত্রের মধ্য থেকে ৭০০টি কাজে লাগবে বলে কলকাতায় অফিসে নিয়ে আসে। কিছু দাঁতও পাওয়া গিয়েছিল, যে গুলির ডি.এন.এ পরীক্ষা করা হয়। বইপত্রে যে সমস্ত হাতে লেখা notes ছিল, সে গুলি হস্তলিপি পরীক্ষকদের কাছে পাঠানো হয়। নেতাজী নাকি উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় 'গুমনামী বাবা' ও 'ভগবানজী' এই দুই নামে বসবাস করেছেন, একত্রিশজন দাবীদার এই কথা বলেছেন।

সরস্বতী দেবী শুক্লা নামে একজন মহিলা ভগবানজীর ঘরের কাজকর্ম করে দিতেন। তাঁর ছেলে রাজকুমার শুক্লা মুখার্জী কমিশনে বলে, তার মা ভগবানজীর কাজকর্ম করে দিয়েছেন ১৯৮৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত। ঐ তারিখে রাম ভবনে ভগবানজী মারা যান। রাজ কুমারের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, সে কলকাতা থেকে আসা অনেককে দেখেছে, যাদের মধ্যে লীলা রায়, সমর গুহ, পবিত্র মোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ২৩শে জানুয়ারীতে নিয়মিত আসতেন। প্রায় প্রতি বছর দুর্গা পূজাতেও এঁরা আসতেন। অতিথিদের সঙ্গে একটি পর্দার আড়াল থেকে ভগবানজী কথা বলতেন। উনিই যে নেতাজী, সে কথা সে জানল কী করে, এই প্রশ্নের উত্তরে রাজকুমার বলে যে তার মা বলেছে ইনিই নেতাজী।

হাতের লেখা পরীক্ষার পর বি লাল (Ex-Govt Examiner of Questioned Documents, New Delhi) জানান যে এই হাতের লেখা নেতাজীর অথচ অমর সিং এবং এল শর্মা (Office of Govt Examiner of Questioned Documents, Govt of India, Simla) তাঁদের যুগ্ম রিপোর্টে এবং কলকাতার ফরেন্সিক সায়েন্স গবেষণাগারের এস কে মন্ডল তাঁর রিপোর্টে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত প্রকাশ করেন।

রামভবন থেকে দেশলাই বাক্সে পাওয়া নটি দাঁতের মধ্যে পাঁচটি দাঁত

পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। নেতাজীর বাবার দিক থেকে দু'জন এবং মার দিক থেকে তিনজন বংশধরের রক্তের নমুনা ডি এন এ পরীক্ষার জন্য কলকাতার Central Forensic Science Laboratory -তে পাঠানো হয়। পাঁচটি দাঁতের মধ্যে তিনটির ডিএন এ পরীক্ষা হয়, পরীক্ষা করেন ডাঃ ভি কে কাশ্যপ, যিনি ঐ গবেষণাগারের ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর রিপোর্টে পরিষ্কার জানানো হয় যে, ঐ দাঁত নেতাজীর পিতৃবংশের অথবা মাতৃবংশের ডি এন এ এর সঙ্গে মেলে না, সুতরাং ঐ দাঁত নেতাজীর হতে পারে না। আচ্ছা, ভগবানজী কি জানতেন যে ভবিষ্যতে তাঁর দাঁতের ডি.এন.এ. পরীক্ষা হতে পারে, তাই যখনই তাঁর দাঁত পড়ে যেত, তিনি সযত্নে একটি দেশলাই বাক্সে তা সংরক্ষণ করতেন? এটা তো বাচ্চারা ক'রে থাকে।

* * * *

একটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। ১৯৪৬ সালের ২২শে জুলাই তারিখে দাদাভাই নওরোজির নাতনী খুরশীদ নওরোজি সাংবাদিক লুই ফিশারকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির একটি অংশ হুবহু তুলে দিচ্ছি।

"at heart the Indian army is sympathetic with the Indian National Army. If Bose comes with the help of Russia, neither Gandhiji nor the Congress will be able to reason with the country". এর বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় যে 'ইন্ডিয়ান আর্মি আন্তরিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতিশীল। যদি বোস রাশিয়ার সাহায্যে ফিরে আসে, তাহলে গান্ধীজী বা কংগ্রেস কেউই দেশবাসীর কাছে জবাব দিতে পারবে না।'

'ট্রান্সফার অব পাওয়ার' (১৯৪২-৪৭) গ্রন্থের ষষ্ঠ ভল্যুমে পাওয়া যায় যে, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের হোম মেম্বার স্যার এফ মুডি (Sir F. Mudie) চিঠি দিচ্ছেন ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ই জেনকিন্সকে (Sir E. Jenkins), চিঠির তারিখ ২৩শে আগষ্ট ১৯৪৫। ঐ চিঠিতে নেতাজীকে নিয়ে কি করা হবে, সে সম্বন্ধে কিছু প্রস্তাব আলোচিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো, ১৮ই আগষ্ট যদি নেতাজীর মৃত্যু হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৩ তারিখে তাঁকে নিয়ে কী করা যায়, ভাবা হচ্ছে কেন?

ঐ চিঠিতে ছিল নেতাজীকে বন্দী অবস্থায় এই দেশে আনা হবে, না কি দূর দেশেই শাস্তি প্রদান করা হবে ইত্যাদি। বিকল্প হিসাবে মুডি নিজে চেয়েছিলেন—

"Leave him where he is and do not seek for his surrender"– অর্থাৎ সে যেখানে রয়েছে, সেখানেই বরং থাকুক। তাহলে প্রশ্ন হলো, তিনি কি তখন অন্য কোনও দেশে বন্দী ছিলেন? দেশটা রাশিয়া হ'তে পারে কারণ ১৯৪৩ সালে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে ভারতের সংগ্রাম থামবে না, যুদ্ধে জাপান পরাস্ত হ'লে রাশিয়ার সাহায্য নিতে হবে, (নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস— তাৎসুয়ো হায়াসিদা - পৃ. ৬৪)।

বৃটিশ ক্যাবিনেটের ইন্ডিয়া অ্যান্ড বার্মা কমিটির কার্য্য বিবরণী থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে, ইন্ডিয়ান অসামরিক বিদ্রোহীদের (Indian Civilian Renegades) সঙ্গে কী করা হবে, তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ঐ মিটিং এ সভাপতিত্ব করছিলেন প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলী (Attlee), তারিখ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৫। সেখানে লেখা হয়েছে যে, কমিটি ভারতীয় অসামরিক অপরাধীদের বিচার এবং শাস্তির বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। আলোচনায় প্রধান বিষয় ছিল নেতাজী, —

"It was generally agreed that the only civilian renegade of importance was Subhas Chandra Bose", অর্থাৎ তাঁদের কাছে সুভাষ চন্দ্র বোস ছিলেন একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অসামরিক বিদ্রোহী। এটাই ছিল তাদের অভিমত। এর অর্থ ১৯৪৫ সালের ২৫শে অকটোবর পর্য্যন্ত নেতাজী নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন, তা না হলে বৃটিশ ক্যাবিনেট তাঁকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে কেন?

এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকরা রাশিয়ায় গিয়ে অনেক চমকপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁরা গবেষণা সূত্রে জানতে পারেন যে, নেতাজী ১৯৪৫ সালের পরেও সেই দেশে ছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ডিফেন্স কমিটির স্টেনোগ্রাফার শ্যামলাল জৈন তদন্ত কমিশনে বলেছিলেন যে, জহরলাল নেহরু তাঁকে দিয়ে একটা চিঠি টাইপ করিয়েছিলেন। যেটা তিনি বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলিকে পাঠাচ্ছেন। সেই চিঠির বয়ান নিম্নরূপঃ—

"I understand from a reliable source that Subhas Chandra Bose, your war criminal, has been allowed to enter Russian territory by Stalin. This is a clear treachery and betrayal of faith by Russians. As Russia has been an ally of British-Americans, it should not have been done" — ("বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানতে পারলাম যে আপনাদের যুদ্ধাপরাধী সুভাষ চন্দ্র বোসকে স্ট্যালিন রাশিয়ায় ঢুকতে দিয়েছে। এটা পরিষ্কার বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাশিয়ানদের দ্বারা কৃত বিশ্বাস হানি। রাশিয়া যেহেতু ঈঙ্গ-আমেরিকান মিত্র শক্তির একজন অংশীদার, এই কাজ তার মোটেই করা উচিত হয় নি।")

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

২০০৫ সালের ৮ই নভেম্বর মুখার্জী কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করে। Commission of Inquiries Act 1952 অনুযায়ী কোনও ব্যাপারে তদন্ত কমিশন তৈরী হলে রিপোর্ট দাখিলের ছ'মাসের মধ্যে ব্যাপারটা পার্লামেন্টকে জানাতে হয়। সরকার তার পর কোনও অ্যাকশন নিল কিনা, নিলে সেটা কী প্রকার তাও পার্লামেন্টকে জানাবার নিয়ম। ২০০৬ সালের ১৮ই মে তারিখে ভারত সরকার এ ব্যাপারে তার বক্তব্য জানায়। নীচে সেটি উদ্ধৃত হল ঃ—

"The Government has examined the report submitted by the Commission on November 8, 2005 in detail and has not agreed with the findings that-

(a) Netaji did not die in the plane crash.

(b) The Ashes in Renkoji Temple are not of Netaji."

বোঝা গেল যে সরকার মুখার্জী কমিশনের বক্তব্যের সাথে একমত নয়, অর্থাৎ এর আগের কমিটি ও কমিশনের যা সিদ্ধান্ত ছিল, সরকারের মতে সেটাই সঠিক।

মুখার্জী কমিশন ছ'বছর ধরে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যে তথ্য ভিত্তিক ও যুক্তি পূর্ণ রায় দিল, সেটা ভারত সরকারের কাছে অযৌক্তিক মনে হল কেন, এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক নয় কি? প্রথম দুটি তদন্ত এত গভীর অনুসন্ধান চালায় নি। তারা একই রায় দিয়েছিল, আমরা দেখেছি। শাহ নওয়াজ খান কেন্দ্রীয় সরকারে উচ্চপদ পেয়েছিলেন, আর খোসলা সাহেব নেহরু গান্ধী পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন মিত্র ছিলেন, তিনি তাঁর তদন্ত চলাকালীনই এই বিষয়টির উপর একখানা বইও লিখে ফেলেন, যদিও আইন অনুসারে তদন্ত চলাকালীন কোনও বিচারক বিচারাধীন বিষয়টির উপর বই বার করতে পারেন না।

২০০৫ সালে Right to Information Act পাস হয়ে গেছে। তবু আজও দেশবাসী জানে না কীসের ভিত্তিতে, কোন যুক্তিতে ঐ রিপোর্টটি ভারত সরকার নাকচ করে দিল। কোনও আর্গুমেন্টকে খন্ডন করতে গেলে কাউন্টার আর্গুমেন্টের দরকার তাই নয় কি? এ ক্ষেত্রে কিন্তু সে সব কিছুই হল না, পার্লামেন্টে সরকার বা বিরোধীপক্ষ, কেউই কিন্তু কোনও তর্কবিতর্কে গেল না, নিঃশব্দে রিপোর্টটি খারিজ হয়ে গেল—

"অপরাধী জানিল না কী বা অপরাধ তার, বিচার হইয়া গেল।"

২০১১ সালের ২৫ শে নভেম্বর লোকসভা সেক্রেটারিয়েটের ডিরেক্টর কল্পনা শর্মা কলকাতা হাইকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য্যের একটি চিঠির জবাব দেন। লোকসভা সেক্রেটারিয়েট ২০১১ সালের গোড়ার দিকে একটি বই প্রকাশ করেছিল, যার নাম Honouring National Leaders : Statues and Portraits in Parliament Complex । এই বইটিতে নেতাজীর মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হয় ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫। রুদ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য্য লোকসভার সেক্রেটারী জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে ২০১১ সালের ২০শে অকটোবর তারিখে একটি চিঠি দেন। সেই চিঠিতে তিনি ঐ মৃত্যুর তারিখটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তারই জবাবে কল্পনা শর্মা লেখেন ঃ—

"The above publication has been examined. The date of death of Netaji Subhas Chandra Bose as stated in the publication should not have been mentioned without a suitable clarification. It is now being clarified by way of adding a foot note to the date of death of the dignitary stating the following :

'The date of death in an air-crash as announced by Tokyo Radio although there is no irrefutable proof of his death in the alleged air crash'.

The omission as above is inadvertent and unintentional and is deeply regretted".

উপরোক্ত বক্তব্যটির তর্জমা করলে দাঁড়ায় যে, 'নেতাজীর মৃত্যুর তারিখ ঐ বইটিতে যা দেওয়া হয়েছে সেটি উপযুক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া উল্লেখ করা উচিত হয় নি। বর্তমানে একটি ফুটনোটের সাহায্যে ঐ তারিখটি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঐ তারিখটি টোকিও রেডিও দ্বারা প্রচারিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তারিখ, যদিও বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর সপক্ষে কোনও অকাট্য প্রমান নেই।'

এই প্রসঙ্গে নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির বসুর পুত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ইতিহাসবিদ সুগত বোসের মন্তব্যের কথা বলতেই হয়। ২০১১ সালে তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, যার নাম His Majesty's Opponent। ঐ পুস্তকে তিনি জানিয়েছেন যে, নেতাজীর মৃত্যু যে, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সালে তাইপেতে বিমান দুর্ঘটনাতেই হয়েছে, তার সপক্ষে জোরালো ঐতিহাসিক প্রমাণ (strong historical evidence) রয়েছে। তিনি আরও লিখেছেন যে, শিশির কুমার বোস সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং ১৯৫৬ সালে জাপান ও তাইওয়ানে নিজে অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

অবশেষে তাঁর সন্দেহ নিরসন হয় এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নেতাজী বাস্তবিকই শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন তাইপেতে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট।

এবার প্রশ্ন হল ২০১১ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে, মৃত্যুর ঘটনার সপক্ষে কোনও অকাট্য প্রমান নেই, এবং তাঁদের ভুলের জন্য অনুশোচনাও করেছেন, এর পরেও কি সুগত বোস তাঁর এবং তাঁর পিতার সিদ্ধান্তে অটল থাকবেন? বেশ তো, থাকুন অটল, কিন্তু কিসের ভিত্তিতে? নাকি বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর?

* * * *

২০১২ সালের বিশে এপ্রিল স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটি খবর বেরোয়। খবরে বলা হয় যে, নেতাজী সুভাষ ১৯৪৬ সালেও যে জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দিল্লী নিবাসী জনৈক অশোক রাইয়ের কাকা কর্ণেল জে.আর. নাগরে বৃটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগ করে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। অশোক রাইয়ের পিতা সোমনাথ রাই এলাহাবাদে জহরলাল নেহরুর বাড়ী আনন্দভবনে প্রায়ই যেতেন। ঐ সময় তিনি কংগ্রেস দলের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত বহু কাগজপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। এলাহাবাদ থেকে নেতাজীর একটি ফটোগ্রাফ পাওয়া গিয়েছিল যেটি দৈবাৎ তাঁর হাত ফসকে মাটিতে পড়ে যায় এবং ভাঙা ফ্রেমের পেছন থেকে এক খণ্ড কাগজ, সম্ভবত: লুকোনো ছিল, বেরিয়ে আসে। সেই কাগজটি ছিল একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী দলিল। দেখা গেল ঐ কাগজটি হচ্ছে কংগ্রেস দলের বুলেটিনের একটি ছাপানো কপি, দলের অফিস সেক্রেটারী সাদিক আলির দ্বারা সম্পাদিত বুলেটিন, সময় জানুয়ারী, ১৯৪৬ সাল। অন্যান্য বিষয় ছাড়া ঐ বুলেটিনে কংগ্রেস দলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তাবিত নাম জমা দেবার শেষ তারিখ উল্লেখ করা ছিল, অর্থাৎ সেই তারিখের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের নাম জমা দিতে হবে। ঐ নোটিসে জানানো হচ্ছে যে পাঁচটি নাম গৃহীত হয়েছিল, তবে ঐ পাঁচটি নাম থেকে দুটি নাম জাতীয় কংগ্রেসের সংবিধান মেনে বাদ দেওয়া হচ্ছে। ঐ পাঁচটি নাম যথাক্রমে:—

(১) জহরলাল নেহরু

(২) বল্লভভাই প্যাটেল

(৩) জে বি কৃপালনী

(৪) সুভাষ চন্দ্র বোস

(৫) জয়প্রকাশ নারায়ণ

বুলেটিনটিতে বলা হচ্ছে যে শেষ দুটি নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে কারণ সুভাষ চন্দ্র বোস চলতি বছরে কংগ্রেস দলের প্রাথমিক সদস্য নন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের নাম বিহার থেকে প্রাপ্ত ডেলিগেটদের নামের তালিকায় পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কি জানতেন যে, সুভাষ চন্দ্র বোস ১৯৪৬ সালেও জীবিত আছেন? তা না হলে তাঁর নাম প্রস্তাবিত হ'ল কিভাবে? নামটি তারপর বাতিল হ'ল কেবলমাত্র তিনি দলের প্রাথমিক সদস্যপদের অধিকারী নন এই কারণে, তিনি মারা গেছেন ব'লে নয়।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক রাজিন্দর পুরী আরও জানিয়েছেন যে, ঐ নোটিসটির মূল কপিটি অশোক রাইয়ের জিম্মায় আছে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বুলেটিনের ঐ বিশেষ অংশটি এই পত্রিকায় ফোটোকপিসহ সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত হয়েছে। খবরটি সত্য নয় ব'লে এখনও পর্যন্ত কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে কেউ দাবী জানায় নি, জানানো সম্ভবও নয়।

শেষ করার আগে পাঠক বৃন্দকে রাউল ওয়ালেনবার্গের সঙ্গে একটু পরিচয় করাতে চাই। ওয়ালেনবার্গ ছিলেন একজন সুইডিশ কূটনীতিক যিনি নাৎসী Concentration Camp থেকে অসংখ্য ইহুদী বন্দীকে বাঁচিয়ে ছিলেন ১৯৪৪ সালে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি ঐ বন্দীদের খেপে খেপে বের করে এনে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের পর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। বুদাপেষ্টে তাঁকে শেষবারের মত দেখা গিয়েছিল, যেখান থেকে রাশিয়ান বাহিনী তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তিনি নিজে ইহুদী ছিলেন তাই ইহুদীদের উপর নাৎসী বাহিনীর অত্যাচার সহ্য করতে পারেন নি। নেতাজীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, রাশিয়াতে তাঁর বন্দী থাকার কথা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে বলেছেন, এঁদের মধ্যে আছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, এবং বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত যাঁরা রাশিয়া থেকে ফেরার পর নেতাজীর ঐ দেশে থাকার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ওয়ালেনবার্গের ক্ষেত্রেও এই একই প্রকার খবর বিভিন্ন দিক থেকে এসেছিল যে, তিনি রাশিয়াতে বন্দী জীবন যাপন করছেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর সুইডিশ সরকার ওয়ালেনবার্গের অনুসন্ধান শুরু করে।

তারা রাশিয়ার সঙ্গে একটি যৌথ কমিশন তৈরী করে তদন্তে নেমে পড়ে। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী গোরান পার্সন (Goran Persson) ঘোষণা করেন যে ওয়ালেনবার্গকে খুঁজে বার করার কাজ তাঁরা চালিয়ে যাবেন যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সত্য উন্মোচিত হচ্ছে।

অবশেষে রাশিয়া স্বীকার করেছে যে, ওয়ালেনবার্গের শেষটা তাদের দেশেই হয়েছে। সুইডেন যেটা পেরেছে, ভারত কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা পেরে ওঠে নি, সদিচ্ছার অভাব, না এর পেছনে কোনও গূঢ় রাজনীতি, যা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য, তা কেবল সময়ই বলতে পারবে।

* * * *

অধ্যাপক গ্রিগরী জি কোটোভস্কি ছিলেন Indo-Russian Joint Commission for Cooperation in Social Sciences- এর ডেপুটি কো-চেয়ারম্যান, তিনি মুখার্জী কমিশনের তদন্ত চলাকালীন বলেছিলেন যে, নতুন এই কমিশন রাশিয়ায় গিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির আর্কাইভ, কে জি বি এবং মিনিষ্ট্রী অব একস্টার্ণাল অ্যাফেয়ার্স-এর ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ এই কবছরের তথ্যাদি যদি দেখতে পারে, তাহলেই সত্য বেরিয়ে আসবে। ঐ ভারতীয় নেতা সত্যিই তাইহোকুতে বিমান দূর্ঘটনায় মারা গেছেন, না মাঞ্চুরিয়া থেকে দাইরেন গিয়েছিলেন, জানা যাবে।

নেতাজী রাশিয়াতে স্ট্যালিন জমানায় বন্দী ছিলেন, এবং তদানীন্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, এই মর্মে একটি প্রেস রিপোর্ট মুখার্জী কমিশন চলাকালীন প্রকাশিত হয়। সেই প্রসঙ্গে কোটোভস্কি বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্ট্যালিন জমানার রেকর্ড আছে, সে গুলি কমিশন পরীক্ষা করে দেখতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সাম্প্রতিক ভারত ভ্রমণের পর ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্কের ব্যাপার একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে এই দুই দেশের সরকারের পক্ষে সংবাদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও বাধার সম্মুখীন হওয়ার কথা নয়, এমন কি ঐ সময়ের বিদেশ মন্ত্রকের ফাইলের তথ্যাবলীর ব্যাপারেও দুই সরকারের ঐক্যমত্য হওয়াটাই স্বাভাবিক।

কোটোভস্কি রাশিয়ান রির্সাচ জার্নাল গুলির কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের

গবেষকরা রাশিয়ান গোয়েন্দা দপ্তরের de-classified তথ্যাবলী দেখতে পেয়েছেন। তাঁরা কিন্তু নেতাজীর ১৯৪৫ সালে রাশিয়ায় আসার ব্যাপারে নিশ্চুপ, যদিও ১৯৪১ সালে রাশিয়া যে নেতাজীকে মস্কো থেকে বার্লিনে যাবার ব্যাপারে সাহায্য করেছিল, সে বিষয়ে তাঁরা বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন অকপটে।

কোটোভস্কি একথাও বলেছেন যে নেতাজীর অর্ন্তধান বিষয়ক বির্তকে রাশিয়ার যে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, ভারত-রাশিয়ার সম্পর্কের স্বার্থেই সেটি ক্লিয়ার করা প্রয়োজন। তিনি অবশ্য এ কথাও বলেন যে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর নেতাজীকে রাশিয়ায় বন্দী করে রাখা বা একটি রহস্যের আবরণে মুড়ে রাখা রাশিয়ার কাছে অপ্রয়োজনীয় ছিল বলেই মনে হয়। ঐ সময় তো ঠান্ডা যুদ্ধের শুরু হচ্ছিল এবং রাশিয়ার কাছে মিত্র পক্ষের প্রতি কোনও বাধ্য বাধকতাও ছিল না। সর্বোপরি বোসকে সবাই একজন বামপন্থী বলেই জানত, আদর্শগত কারণে নেতাজীর রাশিয়ায় অস্তিত্বের ব্যাপারটা সর্বসমক্ষে নিয়ে আসাটাই বেশী স্বাভাবিক হত, রাশিয়ার পক্ষে।

এই খবরটি ২০০১ সালের ১২ই মার্চ স্টেটসম্যন পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

এতো গেল রাশিয়ার কথা। নেতাজীকে আমরা বঙ্গসন্তানরাই বা কতটুকু মনে রেখেছি? আমাদের কলকাতার বুকে যখনই বই মেলা হয়, সেখানে Indian Pavilionও তৈরী হয় বিপুল অর্থব্যয়ে, গেটের দুপাশে সাধারণত: সত্যজিৎ রায় ও জহরলাল নেহরুর ছবি টাঙানো থাকে, বিশাল মন্ডপের চতুর্দিকে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির ছবি সাজানো থাকে, কিন্তু নেতাজীর কোনও ছবি দেখা যায় না, তিনি নিজের শহরের বই মেলায় ব্রাত্য থেকে যান। এরকম উদাহরণ ভূরিভূরি দেওয়া যায়।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ সম্পাদিত 'মেকার্স অব মর্ডান ইন্ডিয়া' গ্রন্থটিতে গান্ধী, জহরলাল নেহরু, সৈয়দ আহমেদ খান যিনি ভারতীয় মুসলিমদের ভারতীয়ত্ব ভুলিয়ে দিয়ে নিজেকে শুধুই মুসলমান হিসাবে ভাবতে শিখিয়েছিলেন, মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি পাকিস্তানের জনক, মর্ডান ইন্ডিয়া তৈরীতে যাঁর কোনও অবদান নেই, যাঁর দ্বি-জাতি তত্ত্ব আধুনিক ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থিত, তাঁরা সবাই জায়গা পেলেন, জায়গা হল না নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের, উপেক্ষিত থেকে গেলেন তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী বিবেকানন্দও, যাঁরা ভারতবাসীকে জাত পাতের উর্দ্ধে উঠতে শিখিয়েছিলেন, জাতি ধর্মের ভেদাভেদ

ভুলে এক জাতি, এক প্রাণ হবার শিক্ষা দিয়ে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে, আধুনিক-মনস্ক হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিলেন, সাহায্য করেছিলেন।

ক্ষমতার শীর্ষে যাঁদের অবস্থান, অতীতে এবং বর্তমানে, তাঁরা ভারতমাতার আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তান নেতাজী সুভাষকে জনমানস থেকে মুছে ফেলার যতই চেষ্টা করুন, তাঁর নাম এদেশের মানুষের হৃদয়ে চির জাগরূক থাকবে, সত্য প্রকাশ পাবেই, হয়ত সে দিনটির আর বেশী দেরী নেই।

জয়হিন্দ

তথ্য সূত্র —

১) *Report of Justice Mukherjee Commission of Inquiry 2005.*

২) *Netaji Subhas Chandra Bose and Indian Freedom Struggle, ed.* Ratna Ghosh– Deep and Deep Publication Private Limited.

৩) *Statement of International Raoul Wallenberg Foundation* (www.raoulwallenberg.net).

৪) *Transfer of Power (Vol VI)– 1942 - 1947, Government of Great Britain.*

৫) *The Statesman* – 12th March 2001.

৬) *The Statesman* – 20th April, 2012.

৭) *সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন* (বৈশাখ ১৪০৫)— বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কোলকাতা-৬।

৮) *The Pioneer–* July 29, 2006, Article named 'Government is not interested in truth' by Murli Manohar Joshi.

লেখক পরিচিতি

পাঠশুরু হাবড়া উদ্বাস্তু প্রাথমিক শিক্ষা নিকেতনে ২য় শ্রেণীতে। হাবড়া হাইস্কুল ও গোবারডাঙ্গা হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী কৃষ্ণকান্ত সরকার এম. এ. ও পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি গবেষণায় নিযুক্ত। *প্রত্নতত্ত্বের আলোতে ভারতের সভ্যতা* তাঁর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

লেখক পরিচিতি

রমা বন্দ্যোপাধ্যায় রসায়ন শাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক, সেন্ট্রাল ড্রাগস্ লেবরেটরীর প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রিয় ছাত্র স্বর্গত ডঃ হীরেন্দ্র কুমার ব্যানার্জীর কন্যা। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী দীর্ঘদিন অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর উপর মৌলিক গবেষণার দ্বারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। নেতাজীর অন্তর্ধান বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থা জাস্টিস মুখার্জী কমিশনের সাথেও যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে চর্চ্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।